মধ্যযুগের ইতিহাস

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class-VII Vide T. B. No. VII/H/81/121 dated 4. 2. 81

মধ্যযুগের ইতিহাস

[সপ্তম শ্রেণী]

ডক্টর মিহির কুমার রায়, এম. এ. (কলিকাতা) ;
বি. এ. অনার্স (লণ্ডন) ; পি. এইচ্. ডি. (যাদবপুর) ;
ইতিহাস বিভাগ : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৩৩ কলেজ রো • কলিকাতা ৯

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'মধ্যযুগের ইতিহাস' বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। সম্প্রতি বইখানি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদন লাভ করেছে। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও শ্রদ্ধেয়া শিক্ষিকা মহোদয়াগণের পছন্দ ও সেই সাথে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ফলেই এই নূতন সংস্করণ সম্ভব হল। আমি তাদের সকলকেই আমার গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

বিনীত
মিহির কুমার রায়

কলিকাতা
জুলাই, ১৯৮১

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ্ কর্তপক্ষ ১৯৮১ সাল থেকে সপ্তম শ্রেণীর জন্য ইতিহাসের নূতন পাঠ্যসূচী চালু করছেন। এই পাঠ্যসূচীতে মোটামুটি ভাবে মধ্যযুগের সভ্যতাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। খ্রীষ্টিয় পঞ্চম শতকে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের সময় থেকে এই পাঠ্যক্রম শুরু হয়েছে ও মধ্যযুগের বেশ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি এতে দেওয়া হয়েছে। এই পাঠ্যক্রম যে ভাবে সাজান হয়েছে তাতে মধ্যযুগের নানা বৈশিষ্ট্যের সাথে ইউরোপের সামন্ত প্রথা, রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পর্কে ও ইসলামের অভ্যুদয় প্রভৃতি বেশ ক'টি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। এগুলি না জানলে সে যুগের সঠিক ধারা বোঝা যায় না তা বলাই বাহুল্য।

'মধ্যযুগের ইতিহাস' বইখানিতে নূতন পাঠ্যক্রমকে বেশ সাবধানের সাথে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। আর ছাত্রছাত্রীদের মানের দিকে লক্ষ্য রেখে বক্তব্য যতদূর সম্ভব সোজাভাবেই বলার চেষ্টা করেছি। প্রতি অধ্যায়ে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মত পাঠগুলি আলাদা ভাবে দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা যাতে বিষয় গুলি ঠিকমত বুঝতে পারে তার চেষ্টাও করেছি।

বইখানির প্রকাশে সহযোগিতার জন্য প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরামের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ এই বইখানি ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত হয়েছে বলে মনে করলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

কলিকাতা
মে, ১৯৮০

বিনীত
মিহির কুমার রায়

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
সভ্যতার মধ্যযুগ

সূচনা ঃ কোন দেশ বা জাতির অতীত ভালভাবে জানতে হলে সেই দেশের ক্রমবিকাশের কাহিনী অর্থাৎ ইতিহাস জানা একান্ত প্রয়োজন। সভ্যতার আদিকালে মানুষ গুহায় বাস করে ফল-মূল খেয়ে জীবন ধারণ করত। কালক্রমে তারা চাষবাস শেখে, সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত হয় ও রাষ্ট্র গঠন করে। মানব সভ্যতার এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় নানা দেশে নানারকম বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। এই সব বৈশিষ্টগুলির ধরণ দেখে আমরা সভ্যতার ধারাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করার চেষ্টা করি, যেমন প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক।

প্রথম পাঠ
মধ্যযুগে ইউরোপ

প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের কথা তোমরা আগেই পড়েছ। এই সম্রাজ্য কালক্রমে দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। পূর্ব দিকের সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল, আর পশ্চিম দিকের সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল রোম। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে গথ, ভাণ্ডাল প্রভৃতি জার্মান জাতিগুলির নেতা ও রোমান সম্রাটের সেনাধ্যক্ষ ওডোয়েসার সম্রাট রোমুল্যাস অগাষ্টুলাসকে গদীচ্যুত করেন। এই কারণে এই সালটিকে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের বছর বলে ধরা হয়। এর ফলে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রাজ্যের সৃষ্টি হয় ও নানারূপ জাতির সূচনা হয়। এই একই কারণে ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দকে ইউরোপে এক নূতন যুগের সুরু বলে ধরে নেওয়া হয়। এই নূতন যুগকে সাধারণতঃ ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যযুগ বলা হয়; গথ, ভাণ্ডাল প্রভৃতি জার্মান জাতিগুলিকে 'অসভ্য' 'বর্বর' বলে উল্লেখ করা হয়। এদের আক্রমণে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের সংহতি প্রথমে নষ্ট হলেও রোমান

সভ্যতা, সংস্কৃতি ও পোপের প্রাধান্য নষ্ট হয় নাই। এ যুগেই শার্লামেন (মহান চার্লস) ও পোপ তৃতীয় লিওর প্রচেষ্টায় পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। শার্লামেন এই সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট পদে অভিষিক্ত হন। পোপের দায়িত্ব এ যুগে বরং আগের চেয়ে অনেকাংশে বেড়েই গিয়েছিল ; আর শিক্ষা, জনসেবা, মানুষের আত্মিক উন্নয়নের ব্যাপারে ইউরোপের খ্রীষ্টান ধর্ম এ যুগে এক বিশেষ ভূমিকা নেয়।

সামাজিক জীবনে সামন্ত প্রথার সৃষ্টি, শহরের উৎপত্তি, নাগরিক জীবন, এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সৃষ্টি মধ্যযুগের বিশেষ অবদান বলা চলে।

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য পতনের পর পূর্ব রোম সাম্রাজ্য আরও প্রায় এক হাজার বছর কাল টিকে ছিল। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব-রোম সাম্রাজ্য বা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের পতন হলে ইউরোপের মধ্যযুগের শেষ ও এক নূতন যুগের সুরু যাকে আমরা আধুনিক যুগ বা নবজাগরণের যুগ বলি। এ যুগের ইউরোপে নূতন বৈশিষ্ট্য হল সামন্ত প্রথার অবসান, পোপের ক্ষমতা হ্রাস, জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে নূতন চিন্তা ভাবনা, সমাজ ব্যবস্থায় নূতনরূপ, জাতীয় চেতনার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পাঠ

মধ্যযুগে ভারত

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য পতনের ফলে ইউরোপে মধ্যযুগের সূচনার মত ভারতেও গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতীয় সভ্যতায় মধ্যযুগের সুরু বলে ধরা হয়। এই দুই সাম্রাজ্যের পতনের ব্যাপারে ঐতিহাসিকরা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে হূণ জাতিকেই দায়ী করেন। গুপ্তযুগের পতন কাল অবশ্য ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে। এই সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি হয় ও সামন্ত রাজারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। মালবের যশোধর্মনের নাম এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। মধ্যভারতে তিনি হূণ আক্রমণ প্রতিরোধ

করে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর উত্তর ভারতে থানেশ্বর, কনৌজ ও গৌড় এই তিন শক্তির উদ্ভব হয়। সপ্তম শতাব্দীতে থানেশ্বর ও কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনে সফল হন। তাঁর মৃত্যুর পর কনৌজকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা হয়। এ যুগে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য পরস্পর বিবাদের ফলে বহিঃশত্রুর আক্রমণের পথ প্রশস্ত করে ও দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ভারতে তুর্কী-আফগান সাম্রাজ্যবাদের পথ প্রশস্ত করে। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ পর্য্যন্ত দিল্লীর এই তুর্কী-আফগান বা সুলতানী আমল। ভারতে মধ্যযুগের সূচনা গুপ্ত যুগের পতনের পর থেকে ধরা হলেও মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য সামন্ত প্রথা পঞ্চম শতাব্দী থেকেই সুরু হয়েছিল। আর পঞ্চদশ শতকের পরিবর্তে ষোড়শ শতকেই দিল্লীর সুলতানী আমল শেষ হয়েছিল।

তৃতীয় পাঠ

যুগের সময় সীমা ; যুগ বিভাজন ; যুগ বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তনের ধারা সর্বত্র এক নয় :

আমরা আগে ইউরোপ ও ভারতের মধ্যযুগ সম্পর্কে পড়লাম। সাধারণ ভাবে পঞ্চম শতকের শেষদিক থেকে ভারত ও ইউরোপে মধ্যযুগের সুরু বলে ধরে নেওয়া হয়। এর কারণ হ'ল এই দুই দেশে এ যুগে কয়েকটি ব্যাপারে মিল দেখা যায় যেমন শিক্ষায় ধর্মের প্রভাব, স্থানীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি, সমাজে পুরোহিত প্রাধান্য ও সংস্কার প্রভৃতি। এ যুগের সীমারেখা পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত চিহ্নিত করা হয়েছে।

তবে সভ্যতার ধারাকে এ ভাবে সময় সীমা দিয়ে বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এক যুগ থেকে অপর যুগে উত্তরণ হঠাৎ সম্ভব নয়। ইতিহাসে এক যুগের সৃষ্টি আগের যুগকে অনুসরণ করেই ঘটে। সুতরাং মধ্যযুগের ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিবর্তন পুরাতনকে কেন্দ্র করেই ঘটে ; তার বিনাশ ঘটিয়ে নয়। মধ্যযুগে

ইউরোপে পোপ ছিলেন সর্বশক্তিমান, আর তার প্রাধান্য বা প্রভাব পঞ্চম শতাব্দীর আগে থেকেই সূচিত হয়েছিল। ঠিক এভাবেই মধ্য-যুগের অবসানের সময় সম্পর্কেও কিছু বলা যায়। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের পতন কালকে ইউরোপের মধ্যযুগের অবসান বলে ধরা হয়। কারণ এর ফলে ইউরোপ এক নূতন সভ্যতার সম্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আন্দোলনের যুগও ইউরোপের ইতিহাসে কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়।

যুগের সময়সীমা সম্পর্কে ভারতের ক্ষেত্রেও এরূপ কিছু বলার অবকাশ আছে। ভারতে মুঘল শক্তির পতন ও ইংরাজ শক্তির উত্থানের যুগকেই ইউরোপীয় মানদণ্ডে আধুনিক যুগের সূচনা বলা চলে। অপর দিকে আবার আমাদের মধ্যযুগের সূচনার সময়ও পঞ্চম শতকের বেশ কিছু পরেই হওয়া উচিত। কারণ ভারতে মুসলমান অনুপ্রবেশের পূর্বে সমাজ, রাষ্ট্র চেতনা ও ধর্ম প্রভৃতি ব্যাপারে নূতন কোন বিশেষ দিক সূচিত হয় নাই।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় কয়েকটির বৈশিষ্ট্য দেখেই সাধারণত যুগ নিরূপণ করা হয়। মধ্য যুগের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সামন্ত ও ভূমিদাস প্রথা। ইউরোপের মত না হলেও প্রকারন্তরে এই সামন্ত প্রথা ভারতে গুপ্ত যুগে চালু ছিল। ইউরোপে আবার পঞ্চদশ শতাব্দীর অনেক পর পর্যন্ত এই প্রথা বেশ কয়েকটি দেশে চালু ছিল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লব ফ্রান্সে এই প্রথার অবসান ঘটায়। এর দীর্ঘকাল পর ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার সার্ফ (ভূমিদাস) দের মুক্তি দেন। প্রাশিয়াতে পঞ্চদশ শতকের দীর্ঘকাল পরেও সামন্ত প্রথা চালু ছিল।

মধ্যযুগে পৃথিবীর বিশেষভাবে ইউরোপ ও ভারতে পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করলে এদের অমিলও চোখে পড়ে। মধ্যযুগের সুরুতে ইউরোপে চরম এক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, কিন্তু এ যুগের শেষে ইউরোপে এক উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠে। এই একই সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিশেষত ভারতে অবশ্য এরূপ পরিবর্তন আসেনি।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions)

এক কথায় উত্তর দাও :—

১। কোন্ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল বলে ধরা হয় ?

২। কোন্ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের পতন হয় ?

৩। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন কোন্ শতাব্দীতে হয়েছিল বলে তুমি মনে কর ?

৪। থিয়োডরিক কোন্ দলের নেতা ছিলেন ?

৫। রোমুলাস কে ?

৬। কোন্ যুদ্ধে আরব মুসলমানরা খ্রীষ্টানদের কাছে হেরে যায় ?

৭। মিহিরকুল কে ছিলেন ?

৮। মধ্যযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি ?

সঠিক উত্তরটির উপর √ চিহ্ন বসাও :—

১। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন ৪৭৩/৪৭৬/৪৮০/৫০০ খ্রীষ্টাব্দ

২। কনস্টান্টিনোপোলের পতন ১৪২৩/১৪৫৩/১৪৭৩/১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দ

৩। পটিয়ার্সের যুদ্ধ ৭২৩/৭৩২/৭৪২/৭৫২/৭৬২ খ্রীষ্টাব্দ

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer Type)

১। ইতিহাসে মধ্যযুগ বলতে কি বোঝায় ?

২। ইউরোপের ইতিহাসে কোন্ সময় থেকে মধ্যযুগ ধরা হয় ?

৩। ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগ কোন্ সময় থেকে স্থরু হয়েছে বলে মনে কর ?

৪। মধ্যযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটির পরিচয় দাও।

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন (Short Essay Type)

১। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য পতনের ফলে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে এর প্রভাব আলোচনা কর।

২। ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের ফলাফল আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মধ্যযুগে পাশ্চাত্য দেশ সমূহ

প্রথম পাঠ

হুণজাতি : জার্মান জাতিগুলির উপর হুণদের চাপ সৃষ্টি : জার্মান জাতিগুলির পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য অভিমুখে প্রচরণ : সাম্রাজ্যের পতন

মধ্যযুগে যে সকল হিংস্র ও 'বর্বর' জাতির নাম জানা যায়, হূণজাতি তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা হল মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ মোঙ্গল জাতির এক শাখা। চীন অনুপ্রবেশে বাধা পেয়ে এরা মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং কালক্রমে উরালসাগর ও ক্যাসপিয়ান সাগরের অপর পারে দক্ষিণ রাশিয়ায় প্রবেশ করে। এই অঞ্চলে বাল্টিক থেকে ভূমধ্যসাগরের মাঝে ভ্রাম্যমাণ জার্মান জাতিগুলির সাথে হূণদের সংঘর্ষ হয় এবং এরই ফলে জার্মান জাতিগুলি পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়।

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশকারী জার্মান জাতিদের মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে—পূর্ব ও পশ্চিম জার্মান দেশীয়। পশ্চিম জার্মান জাতিদের মধ্যে ফ্রাঙ্ক, এঞ্জেল, স্যাক্সন আর পূর্ব-জার্মান জাতিদের মধ্যে গথ, ভাণ্ডাল, বার্গাণ্ডিয়ান ও লম্বার্ড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম জার্মান জাতিগুলির প্রধান উপজীবিকা ছিল পশুচারণ। নূতন চারণভূমির সন্ধানে এদের ভ্রাম্যমাণ জীবন যাপন করতে হত। এইভাবে গথ জাতি কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে উপস্থিত হয় এবং খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে এরা অষ্ট্রোগথ ও ভিসিগথ এই দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে দানিয়ুব অঞ্চলে বসবাস সুরু করে। চতুর্থ শতকের শেষ দিকে হূণরা এই অঞ্চলেই অষ্ট্রোগথদের পরাজিত করে (৩৭৫ খ্রীঃ)। বিতাড়িত গথরা এ সময়ে সম্রাটের অনুমতি নিয়েই রোম সাম্রাজ্য সীমায় প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। রোম সরকারের কর্মচারীদের দুর্ব্যবহারের ফলেই আদ্রিয়ানোপোলে যুদ্ধ হয় (৩৭৮ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে

গথরা জয়লাভ করে। ফলে এ সময় থেকে সাম্রাজ্যে জার্মান জাতিগুলির প্রাধান্য সুরু হয়। হূণরাই ছিল এদের ভীতির কারণ। কিন্তু ৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হূণ নেতা এটিলার মৃত্যু হলে এদের হূণ ভীতি দূর হয়। কারণ তাদের বাধা দেওয়ার মত শক্তি কারুর ছিলনা। ফলে পূর্ব-জার্মান জাতিগুলির নেতা ও সম্রাটের সেনাধ্যক্ষ ওডোয়েসার ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটকে গদিচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করে নেন। এ কারণে এ বছরটিকে পশ্চিম-রোম সম্রাজ্যের পতন বলে ধরে নেওয়া হয়। তবে পরের অন্যান্য ঘটনা বিচার কালে এ সময়ে যে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল তা ঠিক বলা যায়-না। কারণ হল নূতন এই জার্মান উপজাতিরা তাদের বসতিস্থানে নিজেদের সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আইন ব্যবস্থা গড়ে তুলেও রোমের ঐতিহ্যগত ঐক্যকে নষ্ট করেনি বা রোমান আইনকেও তুলে দেয়নি। অন্যপক্ষে তারা আবার রোমান আইনকে নিজেদেরই করে নিয়েছিল ও রোমান ঐক্যের ভাবধারাকে নিজেদের মধ্যে প্রবাহমান রেখেছিল। রোম সাম্রাজ্যের গৌরবময় ভাবধারাকে তারা যে যথেষ্ট সম্মান দিত তার বিশেষ উদাহরণ হ'ল ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্ক রাজা শার্লেম্যান রোমান সম্রাট হিসাবে পোপ কর্তৃক অভিষিক্ত হন। তিনি রোমান সম্রাটদের মতই বিশাল এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। আর জার্মানদের মধ্যে যে নূতন আইন-কানুন চালু হয় তারও মুলে ছিল রোমান আইনবিধি।

দ্বিতীয় পাঠ

বর্বর জাতিগুলির নেতবৃন্দ : এলারিক, এটিলা, গাইসারিক :

(ক) এলারিক : গথ, ভাণ্ডাল, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি জার্মান জাতিগুলি রোমানদের কাছে 'বর্বর' জাতি নামেই পরিচিত ছিল। হূণদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে গথরা রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমানায় প্রবেশ করে। আদ্রিয়ানোপলের যুদ্ধের (৩৭৮ খ্রীঃ) অল্পকালের মধ্যে গথ জাতির দ্বারা সাম্রাজ্যের কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হয় নাই। ৩৮২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের

সাথে এদের এক চুক্তি হয়। এই চুক্তির দ্বারা তারা নিম্ন মেসিয়া অঞ্চলে বাসভূমি তথা সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকার পায়। কিন্তু এতে তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য অথবা ধর্মবিশ্বাস কিছুরই পরিবর্তন হয়নি। এই সময়ে গথরা তাদের সেনাপতি এলারিককে রাজা হিসাবে নির্বাচিত করেন। ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে এলারিক রোম নগরী লুঠ করেন। পর বৎসর দক্ষিণ ইটালীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

(খ) এটিলা ঃ 'বর্বর' হূণজাতির কথা আগেই বলা হয়েছে। এদের শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এটিলার রাজ্য, রাজপ্রসাদ, রাজসভা ও ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে নানা কাহিনী জানা যায়। মধ্য ইউরোপে (বর্তমান অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী অঞ্চল) থেইস্ উপত্যকায় হূণদের রাজ্য ও এটিলার কাহিনী কিংবদন্তী লাভ করেছে। ৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গলদেশ আক্রমণ করেন, কিন্তু রোমান সেনাপতি এতিয়াসের কাছে ট্রয়েস অঞ্চলে পরাস্ত হন। পর বৎসর (৪৫২ খ্রীঃ) এটিলা ইটালী অভিযান করেন। কিন্তু পোপ প্রথম লিওর অনুরোধে তিনি রোম থেকে ফিরে যান। ৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এটিলার মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সাথে তাঁর সাম্রাজ্য নষ্ট হয়।

(গ) গাইসারিক ঃ ভাণ্ডালদের নেতা হিসাবে গাইসারিকের নাম বিশেষ পরিচিত। হূণ ভীতি দূর হবার ও পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যে আশ্রয় লাভের পর জার্মান জাতিগুলির মধ্যে পরস্পর বিবাদ শুরু হয়। এর ফলে গথদের স্পেন ত্যাগ করে ভূমধ্যমহাসাগরের অন্য পারে আফ্রিকায় পাড়ি দিতে হয় (৪২৯ খ্রীঃ)। শস্যসমৃদ্ধশালী অঞ্চল হিসাবে আফ্রিকা এই যুগে খ্যাতি লাভ করে। গাইসারিক প্রায় ৮০,০০০ নরনারীসহ আফ্রিকায় উপনীত হলেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি এই অঞ্চলে স্বাধীন শক্তি হিসাবে ভাণ্ডালদের প্রতিষ্ঠিত করেন।

আফ্রিকায় ভাণ্ডালদের ইতিহাস বলতে গাইসারিকের ব্যক্তিগত জীবনকেই বোঝায়। জলদস্যুতা বৃত্তি অবলম্বন করে ভাণ্ডালরা এই সময় বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ, কর্সিকা, সার্ডিনিয়া সিসিলি প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে। ৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গাইসারিকের মৃত্যুর পরই আফ্রিকায় ভাণ্ডাল শক্তি নষ্ট হয়।

তৃতীয় পাঠ

সাম্রাজ্যে প্রবেশকারী জার্মান জাতিগুলির সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন

রোমান ঐতিহাসিক টেসিটাসের লেখা থেকে জার্মানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। ভারতের আর্যদের সাথে এদের অনেক মিল লক্ষ্য করার মত। নানা উপজাতিতে বিভক্ত হলেও জার্মানরা ছিল মূলতঃ একই জাতি বা ধারার মানুষ। ফলে এদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রা ছিল একই ধরণের। এদের সামজব্যবস্থার প্রথম ধাপ বা মূল ভিত্তি ছিল পরিবার। কয়েকটি পরিবার নিয়ে গড়ে উঠত গ্রাম। এদের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি, পশুপালন ও শিকার। সমাজে মেয়েদের বিশেষ সম্মান ছিল, আর পরিবারে কর্তাদের বিশেষ প্রভাব ছিল। এই গ্রাম ও পরিবারকে কেন্দ্র করেই এক একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠত। জার্মান সমাজে তিন শ্রেণীর লোক দেখা যায়, যেমন অভিজাত, স্বাধীন প্রজা ও ভূমিদাস। বলাবাহুল্য অভিজাতরা সমাজে নানা সুযোগ সুবিধার অধিকারী ছিল। তারাই ছিল বিস্তীর্ণ জমির মালিক। ভূমিদাসরা এদের জমি চাষ করত। তবে রোমান ক্রীতদাসদের চেয়ে এদের অবস্থা অনেক ভাল ছিল। স্বাধীন প্রজারা নিজেদের জমি চাষ করত।

প্রথমদিকে জার্মানদের কোন রাজা ছিলনা। প্রত্যেক গোষ্ঠীর এক একজন গোষ্ঠীপতি বা দলপতি থাকত। প্রতি গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের দলপতিকে বিশেষ আনুগত্য দেখাত। কালক্রমে জার্মানদের মধ্যে রাজপদের সৃষ্টি হয়। প্রতিটি উপজাতি তাদের নেতৃত্বের জন্য তাদের মধ্যে সাহসী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে এই পদে মনোনীত করত। শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে চলা হত। স্থানীয় ব্যাপারে গ্রাম সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার রীতি ছিল।

সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মত ধর্ম-বিশ্বাসেও জার্মানদের সাথে ভারতের আর্যদের মিল দেখা যায়। আর্যদের মত এরাও ছিল প্রকৃতির

উপাসক। সূর্য, চন্দ্র, সমুদ্র, আকাশ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে এরা দেবদেবী রূপে কল্পনা করে পূজা করত। এদের উপাস্য দেবদেবীর মধ্যে 'ওডেন', 'থর', ফিয়া,' 'স্নুন্না' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখ-

যোগ্য। ইংরেজীতে আমরা যে সপ্তাহের দিনগুলির নাম পাই সেগুলি জার্মানদের দেবদেবীর নাম থেকেই এসেছে। চন্দ্র দেবতা 'মানি' থেকে 'মানডে', দেবতা 'টিউ'র নাম থেকে 'টিউস-ডে', দেবতা 'ওডেন'

থেকে 'ওয়েড্‌নেসডে', বজ্র দেবতা 'থর' থেকে 'থার্সডে' সূর্যদেবী 'সুন্না' থেকে 'সানডে' প্রভৃতি।

জার্মানদের বিভিন্ন উপজাতি, যেমন ফ্রাঙ্ক, এঙ্গেল, স্যাক্সন, গথ, ভাণ্ডাল, বার্গাণ্ডিয়ান লম্বার্ড প্রভৃতিদের নাম তোমরা আগেই পেয়েছ।

রাইন ও দানিয়ুব নদী ছিল পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের উত্তর সীমানা। এর অপর পারে জার্মানরা বসবাস করত। হূণদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে এরা সম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বসবাস সুরু করে। গথরা কালক্রমে

অষ্ট্রোগথ ও ভিসিগথ এ-দু'শাখায় বিভক্ত হয়। ভিসিগথরা স্পেনে, অষ্ট্রোগথরা ইটালীতে ও ভাণ্ডালরা আফ্রিকায় বসবাস সুরু করে। ফ্রাঙ্ক নামে জার্মানদের একশাখা গলদেশে বসবাস সুরু করে। এদের নাম থেকেই দেশের নাম হয় ফ্রান্স। এঙ্গেলরা বিট্রেনে বসবাস সুরু করে। আর এদের নাম থেকেই বিট্রেনের নাম হয় ইংল্যাণ্ড।

দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের ফলে জার্মান ও রোমান সভ্যতা পরস্পরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরও প্রাচীন রোমের শাসন ব্যবস্থা, ধর্ম ও আইন কানুন সযত্নেই টিকিয়ে রাখা হয়েছিল। সম্রাট ডায়োকলেটিয়ানের আমল থেকে (২৮৫—৩০৫ খ্রীঃ) গথ, ভাণ্ডাল প্রভৃতি জার্মান উপজাতিগুলি সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত হওয়ার কথা শোনা যায়। কালক্রমে এরা আবার জমির স্বত্ব লাভ করে। ফলে রোমান জমিদারদের মত এরাও একই শ্রেণীভুক্ত হয় ও রোমানদের প্রচলিত আইন এদের অপরিহার্য হয়ে পড়ে। রোমানদের সাথে জার্মানদের বৈবাহিক সূত্রও স্থাপিত হয়।

সাম্রাজ্যে বসতি স্থাপনের পর জার্মানরা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। ফলে খ্রীষ্টান ধর্মে সংযম, সহনশীলতা, দয়া, ভালবাসা প্রভৃতি মানুষের সৎগুণগুলি এদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। মঠের নিয়মানুবর্তিতা, জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টা প্রভৃতি ব্যাপারগুলিও এদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে ও তাদের আগের জীবন যাত্রার ধারায় বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটায়।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন (**Objective Type Questions**)

এক কথায় উত্তর দাও :—

১। রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশকারী জার্মান জাতিগুলিকে মোটামুটি ক'ভাগে ভাগ করা যায় ?

২। 'পশ্চিম জার্মান' জাতিগুলির প্রধান উপজীবিকা কি ছিল ?

৩। এলারিক কত খ্রীষ্টাব্দে রোমনগরী লুণ্ঠন করেন ?

৪। গাইসারিক কোন দলের নেতা ছিলেন ?

সঠিক উত্তরটির উপর ✓ চিহ্ন দাও :—

১। আদ্রিয়ানোপলের যুদ্ধ ৩২৮/৩৪৮/৩৭৮/৩৮৮ খ্রীঃ

২। এলারিকের রোমনগরী লুণ্ঠন ৪০৫/৪১০/৪১৫ খ্রীঃ

৩। এটিলার মৃত্যু ৪৪৩/৪৫৩/৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দ

৪। গাইসারিকের মৃত্যু ৪৫৭/৪৬৭/৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দ

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer Type Questions)

১। হূণ জাতিদের 'বর্বর আখ্যা দেওয়া হয় কেন ?

২। এটিলার নাম কিভাবে জানা যায় ?

৩। এলারিক কিভাবে রাজা নির্বাচিত হন ?

৪। আফ্রিকায় ভাণ্ডালদের ইতিহাস বলতে কি বোঝায় ?

৫। ভিসিগথরা কিভাবে রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি পায় ?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন (Short Essay Type)

১। জার্মান জাতিগুলি কিভাবে রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। এলারিক, এটিলা ও গাইসারিক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

তৃতীয় অধ্যায়

ইউরোপে কল্পিত 'অন্ধকারের যুগ'

প্রথম পাঠ

চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দী : 'অন্ধকার-যুগ' আখ্যা ঠিক নয় :

৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম রোম সম্রাট সিংহাসনচ্যুত হন ও গথ, ভাণ্ডাল প্রভৃতি জাতিগুলি ইউরোপের বিভিন্ন অংশে শাসন ক্ষমতা দখল করে নেওয়ার পর ইউরোপের ইতিহাসকে সাধারণতঃ 'অন্ধকারের যুগ' বলে কল্পনা করা হয়। রোমান আমলের প্রচলিত ব্যবস্থাদি এই যুগে পরিবর্তিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু সবক্ষেত্রে অবলুপ্ত হয় নাই। বর্বর জাতিগুলির পক্ষে সাম্রাজ্যের সভ্যতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা সম্ভব

ছিলনা। কিন্তু তারা যে এ সভ্যতাকে ঘৃণা করত বা সম্পূর্ণ ভাবে উচ্ছেদ করে দিয়েছিল এরকম প্রমাণ পাওয়া যায় না।

পশ্চিম রোম সম্রাট সিংহাহনচ্যুত হওয়ার পরও শাসন ব্যবস্থার তেমন ও সমাজ ব্যবস্থার কোন পরিবর্তনই হয় নাই। ইটালীতে থিয়োডরিকের শাসন কাল (৪৯৩-৫২৬ খ্রীঃ) এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের সৈনাধ্যক্ষ হিসাবেই তিনি আর এক 'বর্বর' জাতির নিকট হতে ইটালী দখল করেন এবং রাজা উপাধি গ্রহণ করেও তিনি সম্রাটের অধীনে ইটালীর প্রচলিত শাসন ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখেন। শাসন কার্যে গথ ও রোমানদের মধ্যে তিনি কোন রকম পার্থক্য সৃষ্টি করেন নাই। নাগরিকদের ধর্ম, আইন ও অন্যান্য সব ব্যাপারেই তিনি পরম সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন। রোমান আমলের নিদর্শনগুলি তিনি সযত্নে রক্ষা করেন এবং রাস্তাঘাট প্রভৃতির সংস্কার সাধন করেন। এমনকি তাঁর লক্ষ্য ছিল নিজ জাতির মধ্যেই রোম ভাবধারায় তাদের 'সভ্য' করে তোলা। এসব কারণে এ যুগকে 'অন্ধকারের যুগ' আখ্যা দেওয়া ঠিক নয়।

দ্বিতীয় পাঠ

জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা ব্যবস্থা

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের কালে ইউরোপের রাজনৈতিক একতা নষ্ট হয় এবং এই মহাদেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন জাতি পৃথক পৃথক রাজ্যের সৃষ্টি করে। ইউরোপের ইতিহাসের এই যুগকে আমরা 'অন্ধকারের যুগ' বলে থাকি। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম এবং খ্রীষ্টান ভিক্ষুরা এই যুগে এক অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধনের ভূমিকা গ্রহণ করে। খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে বহু খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী ধর্মের আনুষ্ঠানিক ও বৈষয়িক দিক হতে বিরত হয়ে লোকালয় থেকে বহুদূরে এবং সন্ন্যাস জীবনের কঠোরতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হন। এ থেকেই কালক্রমে আশ্রম প্রথার (ইংরেজীতে 'মোনাস্টিসিজ্ম্') উৎপত্তি হয়। এই ভিক্ষুরা ঈশ্বর আরাধনা ছাড়াও জনসেবা তথা জ্ঞান বিতরনের কাজে নিজেদের নিয়োগ করেন। দেশের সরকারী

শাসন ব্যবস্থার মত এ যুগে আশ্রম প্রথারও সুবিন্যস্ত সংগঠন ও পরিচালনা ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। মঠবাসী এই ভিক্ষুগণ জ্ঞান আহরণের জন্য সকল বিষয়েই পড়াশুনা করতেন এবং বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও প্রাচীন পুঁথিপত্র অনুবাদ করে তাঁরা রোম ও গ্রীক সাহিত্যের ধারাকে অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে ইটালীর গথরাজা থিয়োডরিকের আমলের সেনেটার ও উপদেষ্টা ক্যাসিডোরাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। থিয়োডরিকের মত তিনিও মনে করতেন যে দেশের উন্নতির জন্য রোমান ও গথ উভয়জাতির পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। এ জন্য তিনি দেশে শিক্ষিত যাজক সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর নিয়ে 'ভিভেরিয়াম' নামে তিনি এক আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। জার্মানদের শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে তিনি তার আশ্রমবাসী ভিক্ষুদের জ্ঞান চর্চার উপর বিশেষভাবে জোর দেন। রোমে তিনি এক শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করেন। অল্পকালের মধ্যে তিনি নিজের আশ্রমেই সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেন এবং এখানে একটি পাঠাগার ও মঠবাসীদের জন্য কিছু বইও রচনা করেন। আশ্রমে বাইবেল পাঠ ছাড়াও জ্ঞান চর্চার অঙ্গরূপে প্রাচীন সাহিত্য ও অন্যান্য পুস্তকের অনুবাদ সুরু হয়।

তৃতীয় পাঠ
ধর্মের প্রভাব

জ্ঞান চর্চা, শিক্ষা বিস্তার, চিকিৎসা, আশ্রয় প্রভৃতি ছাড়াও এ যুগে জার্মান জাতিগুলির নৈতিক বোধ উন্নয়নের কাজে আশ্রম বাসী খ্রীষ্টান ভিক্ষুদের দান কম ছিল না। এ যুগে সামাজিক শিষ্টাচার, বিনয়, নম্রতা, সত্যবাদিতা, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ন্যায় অন্যায় বোধ প্রভৃতি মানুষের সৎগুণগুলি বিকাশের জন্য জনৈক লেখক আশ্রম প্রথা তথা আশ্রমবাসী ভিক্ষুদের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। অন্য এক লেখক এই জাতিগুলির খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়াকে 'বর্বরতা' হতে 'সভ্যতায়' পদক্ষেপ বলে মনে করেন।

ভাণ্ডাল, গথ প্রভৃতি জাতির দ্বারা পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য নষ্ট হয়েছিল সত্য, কিন্তু পোপ বা রোমের সভ্যতা ও পবিত্রতা আগের মতই অক্ষুণ্ণ ছিল।

৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য পতনের কালে পোপই এই অঞ্চলের শুধুমাত্র একতার নিদর্শন হিসাবেই টিকে রইলেন না, তাঁর ক্ষমতাও বৃদ্ধি হয়। পূর্ব রোমান সম্রাটের কোন রকম সাহায্য ছাড়াই তিনি নিজের এবং ধর্মের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হন। ইটালীতে লম্বার্ড আক্রমণ যুগে পোপ প্রথম গ্রেগরী রোম রক্ষা করেন এবং পোপ দ্বিতীয় গ্রেগরী লম্বার্ডদের সাথে মিত্রতার সূত্রে আবদ্ধ হন।

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য পতনের যুগে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাবের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে জনৈক লেখক মন্তব্য করেছেন যে, এই যুগের ধর্মীয় সংগঠন শুধুমাত্র সকল প্রকার ঝড় ঝঞ্ঝা কাটিয়েই উঠেছিল তাই নয় দেশের সরকারের যাবতীয় দায়িত্ব পালন ও 'বর্বর' জাতিগুলিকে এর সংগঠনের মধ্যে এনে ইউরোপে সভ্যতা তথা স্থায়িত্বের পথ সৃষ্টি করা।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions)

এক কথায় উত্তর দাও :—

১। থিয়োডরিক কে ছিলেন ?

২। 'মোনাষ্টিসিজম' কথাটির বাংলা কি ?

৩। 'ভিভেরিয়াম নামটি কিসের ?

সঠিক উত্তরটির উপর √ চিহ্ন দিয়া বুঝাইয়া দাও :—

১। ইটালীতে থিয়োডরিকের শাসনকাল ৪৭৩-৪৯৬/৪৯৩-৫২৬/৫২৬-৫৫৬ খ্রীঃ

২। ক্যাসিডোরাস—ইটালীর রাজা/সেনেটার

৩। ইটালীতে লম্বার্ড আক্রমণ যুগে পোপ ছিলেন—প্রথম গ্রেগরী/তৃতীয় পেপিন

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer Type Questions)

১। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য পতনের পর ইউরোপের ইতিহাসকে 'অন্ধকারের যুগ' বলা হয় কেন ?

২। ইউরোপে 'অন্ধকারের যুগে' খ্রীষ্টান ভিক্ষুদের ভূমিকা কি ছিল?
৩। আশ্রমপ্রথা সৃষ্টি হওয়ার কারণ কি?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন (Short Essay Type)

১। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য পতনের পর ইউরোপের ইতিহাসকে 'অন্ধকারের যুগ' বলা ঠিক নয় এ সম্বন্ধে তোমার মতামত লিখ।
২। পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিক থেকে ইউরোপে শিক্ষা-ব্যবস্থায় খ্রীষ্টান ভিক্ষুদের অবদানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

চতুর্থ অধ্যায়

বাইজাণ্টাইন সভ্যতা

প্রথম পাঠ

কন্‌স্টাণ্টাইন কর্তৃক কন্‌স্টাণ্টিনোপলের পত্তন : খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ৭৫৩ বছর আগে রেমাস ও রম্যুলাস্ নামে দুই ভাই রোমনগরী স্থাপন করেন। রম্যুলাসের নাম থেকেই এই নগরের নাম হয় রোম। প্রথমে রোম ছিল ইটালীর নগরভিত্তিক এক ক্ষুদ্র রাজ্য। কিন্তু কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতির ফলে এর আয়তন বেড়ে গিয়ে এক সাম্রাজ্যের রূপ নেয়। ইউরোপের পশ্চিম ও দক্ষিণের দেশগুলি—ইংল্যাণ্ড, স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী, বলকান অঞ্চল, গ্রীস, উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার বিরাট অংশ—ম্যারিটানিয়া, নিউমিদিয়া, ত্রিপোলী, লিবিয়া, মিশর, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এরকম এক বিশাল সাম্রাজ্যকে একই জায়গা থেকে শাসন করার অসুবিধা দেখা দেয়। এছাড়া পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের সীমানায় জার্মান জাতিগুলির আক্রমণ ভীতি সবসময় লেগেই ছিল। এমন কি এদের দ্বারা রোমনগরীও আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। ফলে ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট তৃতীয় কন্‌স্টাণ্টাইন্ কৃষ্ণসাগরের তীরে এশিয়া ও ইউরোপের মিলনস্থল ও

প্রাচীন গ্রীক উপনিবেশ বাইজান্টিয়াম নামে শহরে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। সম্রাটের নাম থেকেই এই নূতন রাজধানীর নাম হয় কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্।

৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট থিয়োডোসিয়াস মারা যাওয়ার পর তাঁর দুই পুত্র অন্‌রিয়াস ও আর্কেডিয়াস সাম্রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে ভাগ
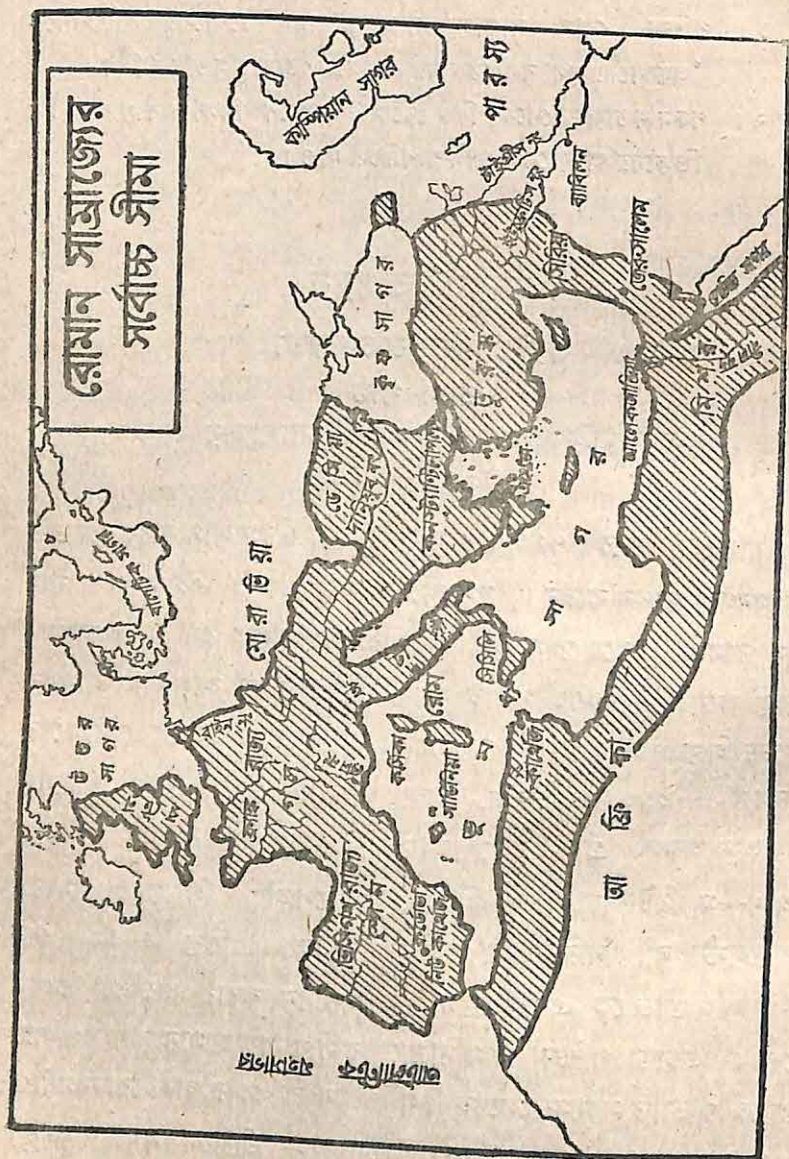
করে নেন। ফলে এ সময় থেকে রোম সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিম এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় রোম আর পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী হ'ল কনস্টান্টিনোপল। পূর্ব রোম সাম্রাজ্য বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য নামেও পরিচিত ছিল। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্ব বা বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য টিকে ছিল।

কন্‌স্টাণ্টাইনের রাজত্বকালের (৩০৬-৩৩৬ খ্রীঃ) অপর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল সম্রাট কর্তৃক খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ। তাঁর আগে একাধিক
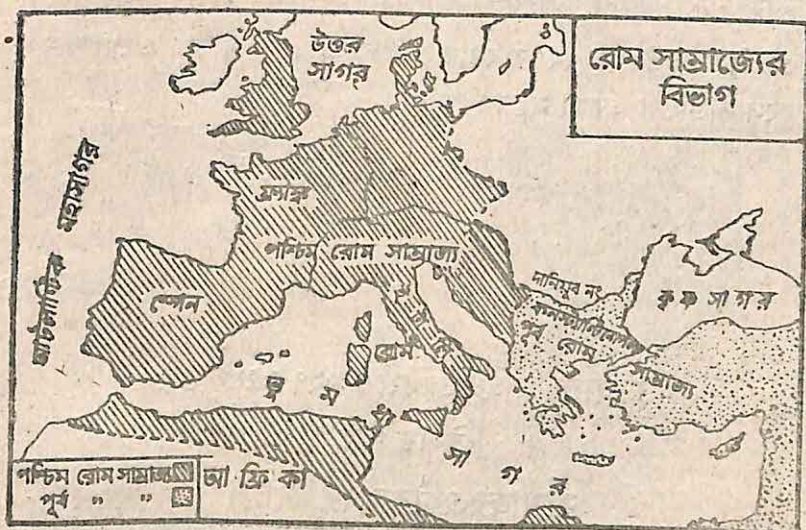
সম্রাট খ্রীষ্টানদের উপর অত্যাচার করেছিলেন। কনস্টাণ্টাইন বিরোধিতা না করে একে সমর্থন করাই ভাল মনে করেছিলেন। ৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই ধর্ম গ্রহণ করেন। মিলানের ঘোষণাপত্রে তিনি খ্রীষ্টানধর্মের বৈধতা স্বীকার করে নিলেন এবং রাষ্ট্রের উপর এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিলেন। সম্রাট ডায়োক্লেটিয়ানের আমলে চার্চ ও চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। কন্‌স্টাণ্টাইন সেগুলি ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁর মুদ্রা থেকে পূর্বেকার দেবদেবীর ছবি উঠিয়ে দেন। ক্যাথলিক যাজকদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হল এবং চার্চের দাসদের

মুক্তি দেওয়া হল। এভাবে খ্রীষ্টান ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীরা সরকারী আনুকুল্য লাভ করল।

কন্‌স্টান্টাইনের খ্রীষ্টান ধর্মের পৃষ্টপোষকতার পিছনে রাজনৈতিক কারণ ছিল। ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া অপেক্ষা রাজনৈতিক কারণেই তিনি এই ধর্মকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেন। তাঁর আগের আমলে এই ধর্মের প্রতি সরকারী বিরোধিতা ও অত্যাচার সত্বেও এর জনপ্রিয়তা বাড়তে সুরু করে। এ কারণেই তিনি এই ধর্মের প্রতি বিরোধিতার বদলে সমর্থনের নীতি গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্টান ধর্মের মত বিশ্বজনীন সংস্থা, এর পরিচালন ও সংগঠন ব্যবস্থার ফলে সাম্রাজ্যের অধিকাংশ শ্রেণীরই সমর্থন লাভের সম্ভাবনা ছিল। অপরদিকে প্রচলিত অখ্রীষ্টান ধর্ম ব্যবস্থায় বিভিন্ন মতবাদ, সংস্কার ও গোঁড়ামির ফলে সাম্রাজ্যে একতা সম্ভব ছিল না।

সম্রাট জাস্টিনিয়ান (৫২৭-৬৫ খ্রীঃ)

দ্বিতীয় পাঠ

সাম্রাজ্য একীকরণের প্রচেষ্টা

জাস্টিনের মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপো জাস্টিনিয়ান পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট হন। 'বর্বর' জাতিগুলির আক্রমণে পূর্ব রোম সাম্রাজ্য নষ্ট হয়। এর পুনরুদ্ধারের জন্য আগে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় জাস্টিনিয়ানকে তারই প্রতিমূর্ত্তি বলা যায়। তাঁর আমলে আফ্রিকায় ভাণ্ডাল, স্পেনে ভিসিগথ, উত্তর ও পশ্চিম ফ্রান্সে ফ্রাঙ্ক, ইটালীতে অষ্ট্রোগথ প্রভৃতি জার্মান জাতিগুলি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। জাস্টিনিয়ান রোমের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনবার জন্যে এই জাতিগুলির সাথে যুদ্ধের সংকল্প নেন।

এই জাতিগুলির পারস্পরিক বিভেদ তাঁকে এই কাজে বিশেষ উৎসাহ দেয়।

আফ্রিকায় ভাণ্ডালদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাদের গৃহ-বিবাদের সুযোগ নিয়ে জাস্টিনিয়ান বেলিসেরিয়াসের নেতৃত্বে বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। ৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে ত্রিকাম্যারনের যুদ্ধে ভাণ্ডালরা সম্পূর্ণরূপে হেরে গেল এবং আফ্রিকার ভাণ্ডালদের রাজ্য পুনরায় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল।

জাষ্টিনিয়ান

আফ্রিকায় জয়লাভের পর বেলিসেরিয়াসকে আবার ইটালী উদ্ধারে পাঠান হয়। আফ্রিকায় ভাণ্ডালদের মত এখানেও অষ্ট্রোগথদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পদানত হয়েছে মনে করে বেলিসেরিয়াস ফিরে আসেন। এদিকে গথরা টটিলা নামে এক নূতন রাজা নির্বাচন করে ইটালী পুনরুদ্ধার করে নেয়। এরপর জাস্টিনিয়ান নর্সেস নামে সৈনাধ্যক্ষকে পাঠান। টটিলা যুদ্ধে নিহত হলেন (৫৫২ খ্রীঃ)। পরের বছর নর্সেস সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করলেন এবং গথদের শক্তি ধ্বংস হল।

স্পেনে এই সময় ভিসিগথদের মধ্যে এক গৃহযুদ্ধ চলছিল। জাস্টিনিয়ান সেখানেও সৈন্য পাঠালেন। তবে এ যুদ্ধে জাস্টিনিয়ানের সেনারা স্পেনের দক্ষিণ উপকূলভাগের কিছু অংশ ও বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে মাত্র।

আপতদৃষ্টিতে জাস্টিনিয়ানের এই প্রচেষ্টা এক অসাধারণ সাহস ও

শক্তির পরিচয় দিলেও তাঁর এই নীতির বেশ কয়টি ত্রুটি ছিল। তাঁর এই সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা কাজে রূপায়িত হয় নাই।

তৃতীয় পাঠ
আইন বিধি

জাস্টিনিয়ান শুধুমাত্র হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে সাম্রাজ্যের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনবার চেষ্টাই করেননি, বিচার ব্যবস্থায় প্রতিটি নাগরিকের জন্য ন্যায় ও সম আইন প্রভৃতির প্রতিও তিনি যথেষ্ট পরিমাণে যত্নশীল ছিলেন। তাঁর আমলে রোমান আইন বিধি এত বিশাল আকার ধারণ করে যে বিচারকদের বিশেষত প্রাদেশিক বিচারালয়-গুলিতে আইনের ব্যাখ্যা সব ক্ষেত্রে একই রূপ হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। ফলে একই ধরণের মামলায় বিভিন্ন বিচারালয়ে রায় দান একই ধরণের হত না। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে জাস্টিনিয়ান আইনগুলিকে নূতনভাবে প্রণয়নে সংকল্প গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যে ৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন আইনজ্ঞকে নিয়ে একটি কমিশন গঠিত হয় এবং পাঁচ বছর পর 'করপাস্ জুরিস্ সিভিল' নামে কয়েক খণ্ডে আইনবিধি সুবিন্যস্ত করা হয়। ইতিপূর্বে (৪৩৮ খ্রীঃ) দ্বিতীয় থিয়োডিসিয়াসের আমলে আইনবিধির সংকলন করা হয়েছিল। কিন্তু জাস্টিনিয়ানের আমলের এই সংকলন অনেক যুগোপযোগী করে তোলা হয়। বস্তুত এই প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়নের জন্য জাস্টিনিয়ান ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

জাস্টিনিয়ানের আনইবিধির কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই এর স্থায়িত্বের কথা বলতে হয়। রোমান আইন বহুশতাব্দীর প্রচলিত রীতিনীতির ওপরেই গড়ে উঠেছিল। জাস্টিনিয়ানের আইনবিধি কেবলমাত্র সাম্রাজ্য পরিচালনায় আইন কি ভাবে রচিত হওয়া উচিত ছিল তাইই নয়, একে মানুষের জীবন দর্শনেরই এক আলেখ্য বলা যায়। তাঁর এই প্রচেষ্টা স্বভাবতই প্রজাদের মনে সাম্রাজ্য তথা সম্রাটের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি করে।

শাসন কাজের সুবিধার জন্য এই সংকলনে জাস্টিনিয়ান রোমান আইনের সঙ্গে নূতন আইনও যোগ করেন। নিরপেক্ষ শাসন ও বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটদের অসৎ উপায়ে চাকুরী গ্রহণ

নিষিদ্ধ করেন। ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য কোন কর্মচারী নাগরিকদের অসুবিধার সৃষ্টি করলে তাদের চাকরী থেকে অপসারণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বিচারে অনির্দিষ্ট কাল বিলম্বও রহিত করা হয়।

চতুর্থ পাঠ

স্থাপত্য, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির পৃষ্ঠ-পোষকতা

আইনবিধি প্রণয়নেই জাস্টিনিয়ানের উৎসাহের শেষ হয়নি। দেশের স্থাপত্য শিল্প, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির উন্নতিতেও তাঁর আগ্রহ ছিল অসীম। তাঁর আমলের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনগুলিকে মোটামুটি এই কয়টি অঞ্চল সমূহে ভাগ করা যায়। যথা, (ক) কন্‌স্টান্টিনোপলে নির্মিত চার্চ ও অন্যান্য অট্টালিকা সমূহ, (খ) পারস্য সীমায় নির্মিত ও পুনঃস্থাপিত নগর সমুহ, (গ) ককেশাস্‌, আর্মেনিয়া, বল্কান ও গ্রীস, মিশর, উত্তর আফ্রিকা, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি অঞ্চলের নির্মাণ সমূহ। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল উত্তর আফ্রিকার সীমান্ত অঞ্চলের দুর্গ সমূহ, সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমায় সুরক্ষিত নগর সমূহ, দানিয়ুব অঞ্চলে ব্যূহ প্রাচীর প্রভৃতি।

দুর্গ প্রভৃতি ছাড়াও জাস্টিনিয়ানের আমলের অপর উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যের নিদর্শন হল নগরীর শোভা বর্ধন। স্থাপত্য শিল্পের এই উৎকর্ষ বর্ণনা করতে গিয়ে জনৈক লেখক জাস্টিনিয়ানের আমলকে স্থাপত্য শিল্পের স্বর্ণ যুগ বলেছেন। কন্‌স্টান্টিনোপলের 'সান্তাসোফিয়া' গির্জা তাঁরই আমলে নির্মিত হয়। স্থাপত্য শিল্পের এহেন এক অপূর্ব সৃষ্টি, ইটালীর রাজপ্রসাদ, 'সেণ্ট ভিতেল্‌' গির্জা ও থিয়োডরিকের নিদর্শনগুলিকে ম্লান করে দেয়। প্রোকোপিয়াসের লেখায় জাস্টিনিয়ানের আমলের স্থাপত্য শিল্পের তথা চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির বর্ণনা পাওয়া যায়।

জাস্টিনিয়ানের আমলে দেওয়াল চিত্রাঙ্কনও বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। খ্রীষ্টান আশ্রমগুলির দেওয়ালে এই চিত্রগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে বাইজান্টাইন্‌ সাম্রাজ্যের চিত্র-অঙ্কন পদ্ধতির

ধারা পরবর্তী কালে ইটালী ও স্পেনে বিশেষ সমাদর পায়। বর্তমান যুগের পাণ্ডুলিপিগুলিকে সুন্দর চিত্র দিয়ে আবৃত করা ও প্রতিমা প্রভৃতিতে বিভিন্ন রংয়ের ব্যবহার এই ধারাকেই অনুসরণ করে চলেছে।

পঞ্চম পাঠ

ব্যবসা বাণিজ্য ও সংহতির রক্ষক হিসাবে বাইজাণ্টিয়ামের গুরুত্ব

কনস্টাণ্টিনোপলের ভৌগলিক অবস্থিতি শুধুমাত্র একে এক দুর্ভেদ্য দুর্গেই পরিণত করেছিল তাই নয় ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তিনদিক জলবেষ্টিত এই নগরী অচিরেই দূর প্রাচ্য ও পশ্চিম দুনিয়ার বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। এই বৈদেশিক বাণিজ্যের ছিল বাইজাণ্টিয়াম সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির অন্যতম প্রধান উৎস। এসময় মধ্য এশিয়া থেকে চীন ও ভারতের বাণিজ্যপথে কনস্টাণ্টিনোপলের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এদেশের বণিকরা সিংহল, চীন, ভারত, রাশিয়া, মিশর, ইথিওপিয়া প্রভৃতি দেশের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করিত। ভারত ও সিংহল থেকে নানা ধরনের মশলা, চীন থেকে রেশম জাত বস্ত্র রাশিয়া থেকে চামড়া, কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী দেশগুলি থেকে শস্য প্রভৃতি আমদানী করা হত। বাইজাণ্টিয়াম থেকে নানারূপ শিল্পজাত সামগ্রী যেমন কাঁচা ও এনামেলের জিনিষ, নানারূপ দামীকাঠ, হাতীর দাঁতের তৈয়ারী নানারূপ জিনিষপত্র রপ্তানী হত। জাষ্টিনিয়ানের আমলে চীন থেকে রেশমগুলি আমদানী হয় ও ৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বাইজাণ্টিয়াম রেশমশিল্প গড়ে ওঠে। শুল্ক ও শিল্পে একচেটিয়া অধিকারের ফলে সরকারের স্থায়ী আয় হত প্রচুর। এরদ্বারা স্থল ও নৌবাহিনীর ভরনপোষণ সহজসাধ্য ছিল। পশ্চিম সাম্রাজ্যে এরকম আয়ের দ্বারা সেনাবাহিনীর ভরণ পোষণের প্রথা ছিল না।

বাইজাণ্টাইন্ সাম্রাজ্য বলতে আমরা সাধারণত পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল কন্‌স্টাণ্টিনোপলকেই মনে করি।

কিন্তু বাইজাণ্টাইন্ কথাটির তাৎপর্য এখানেই শেষ নয়। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাবে জার্মান জাতিগুলির অনুপ্রবেশের পর স্থানীয় অধিবাসী ও নবাগতের সংমিশ্রনে এক নূতন সভ্যতা গড়ে ওঠে। পূর্ব রোম সাম্রাজ্যেও তেমনই নূতন না হলেও নূতন ধরণের সভ্যতার সৃষ্টি হয়। গ্রীক সাহিত্য, কলা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির উপর ভিত্তি করেই এই সভ্যতা গড়ে ওঠে।

বাইজান্টিয়ামে পৌত্তলিক গ্রীক সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং দর্শন প্রভৃতির সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের ঈশ্বর তত্ত্বের কোন বিবাদ দেখা দেয় নাই। ফলে গ্রীক সাহিত্য পাঠ তথা পাণ্ডুলিপিগুলি সযত্নে রক্ষা ও এদের প্রতিলিপির প্রবণতা এই যুগে বিশেষভাবে দেখা যায়। সাহিত্য ছাড়া বাইজাণ্টাইন্ পণ্ডিতগণ জ্ঞানকোষ ও অভিধান প্রভৃতি রচনা করেন এবং ইতিহাস, সাধুসন্তদের জীবনী, চিকিৎসাশাস্ত্র, আইন ও ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে লেখার ধারা সৃষ্টি হয়। গ্রীক কাব্য সঞ্চয়ণ প্রভৃতির জন্যও আমরা বাইজাণ্টাইন্ সভ্যতার নিকট ঋণী। এযুগে কয়েকজন শিক্ষিত সম্রাট শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসারের জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে সম্রাট সপ্তম কন্স্টাণ্টাইনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। উত্তরকালে এই কাজ শিক্ষিত মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে প্রসার লাভ করে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের ধারক হিসাবে বাইজাণ্টাইন্ সাম্রাজ্যের স্থান অপরিশোধনীয়।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions)

এক কথায় উত্তর দাও :—

১। কার নাম থেকে রোমের নামকরণ হয় ?

২। কার নাম থেকে কনস্টান্টিনোপলের নামকরণ হয় ?

৩। জাষ্টিনিয়ান কার মৃত্যুর পর পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট হন ?

৪। হিলডারিক কে ছিলেন ?

৫। কনস্টান্টিনোপলে সান্তাসোফিয়া গির্জা কার রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল ?

সঠিক উত্তরটির উপর √ চিহ্ন দিয়া বুঝাইয়া দাও :—

১। রোমনগরীর পত্তন যীশুখৃষ্টের জন্মের ৭৪৩/৭৫৩/৭৬৩ বছর আগে।

২। কনস্টান্টিনোপলনের পত্তন ৩২০/৩২০/৩৩০/৩৪০ খৃষ্টাব্দ

৩। ত্রিকাম্যারণের যুদ্ধ ৫২৩/৫৩৩/৫৪৩/৫৫৩ খৃষ্টাব্দ

৪। টটিলার মৃত্যু ৫৩২/৫৪২/৫৫২/৫৬২ খৃষ্টাব্দ

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer Type)

১। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বাইজান্টিয়ামে নূতন রাজধানী স্থাপনের কারণ কি ছিল ?

২। তৃতীয় কনস্টাণ্টাইনের খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার পিছনে কি কারণ ছিল ?

৩। সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের প্রধান লক্ষ্য কি ছিল ?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন (Short Essay Type)

১। সাম্রাজ্য একীকরণের প্রচেষ্টায় সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের ভূমিকা বর্ণনা কর।

২। জাষ্টিনিয়ানের আইনবিধির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। ব্যবসাবাণিজ্য ও সংস্কৃতির রক্ষক হিসাবে বাইজান্টিয়ামের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামের অভ্যুদয় ও তার প্রভাব

প্রথম পাঠ

আরবদেশ ও জাতি

এশিয়া মহাদেশের পশ্চিমদিকে পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল আরবদেশ নামে পরিচিত। এই দেশের অধিবাসীদের আরব বলা হয়। এদেশের উত্তর অঞ্চল বহুকাল থেকেই নানা সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। সুমের, ব্যাবিলন, আসীরীয়, পারস্য, রোম প্রভৃতি সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের নাম এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এদেশের মূল ভূখণ্ড এ সকল সভ্যতা বা সাম্রাজ্যের

অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। তবে মিশর, সিরিয়া প্যালেস্টাইন প্রভৃতি দেশগুলির সাথে ভারতের বাণিজ্যের সুত্র ধরে এই ভূখণ্ডের সঙ্গে বাহিরের জগতের যোগাযোগ ঘটে। ব্যবসা বাণিজ্যের সুত্র ধরে আবার বহু ইহুদী আরব অঞ্চলে বসবাস সুরু করে। স্থানীয় আরব উপজাতিদের আচার-ব্যবহার তাদের প্রভাবিত করলেও এরা কিন্তু নিজেদের পৃথক স্বত্বা সম্পূর্ণরূপে বজায় রেখেছিল। হজরৎ মহম্মদের জন্মকালে আরবদেশে সুসংগঠিত কোন রাষ্ট্র ছিল না। আরবরা ছিল মূলত যাযাবর ও গেষ্ঠীগত জীবনে অভ্যস্ত। বেদুইন নামে দেশের অভ্যন্তরের অধিবাসীরা মেষপালন প্রভৃতির দ্বারা সংসার চালাত। এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অপর গোষ্ঠীর বিবাদ প্রায় লেগেই থাকত। অবশ্য প্রতিবৎসরে যে চারমাস মক্কা ও মদিনায় ধর্মসংক্রান্ত মেলা চলত সে সময় এদের মধ্যে কিছুটা ভাব দেখা যেত। মরুভূমির কঠোর জীবন যাত্রা এদের জীবনকে কঠোর, স্বনির্ভর ও পরিশ্রমশীল করে তোলে।

হেজ্জাজ অঞ্চলে কোরেশ উপজাতিদের শাসনে মক্কাই ছিল এই সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর। বৎসরের কয়েকমাস মক্কার মেলা চলার সময় বিভিন্ন উপজাতিরা এখানে তাদের পণ্যসামগ্রী বিক্রী করতে আসত। ফলে এই শহর বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে নাম করে। কিন্তু মক্কার গুরুত্ব ছিল অন্য কারণে। জগৎ-বিখ্যাত কাবায় আরবদের দেবদেবীর মুর্ত্তিগুলি ও কাল পাথরখানি সযত্নে রক্ষা করা হত। ফলে মক্কা আরবদের কাছে এক অতি পবিত্র অর্থাৎ তীর্থস্থান হিসাবেই চিহ্নিত ছিল। কথিত আছে কাবার এই কাল পাথরখানি স্বর্গ থেকে দেবতারা পাঠিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় পাঠ

হজরৎ মহম্মদ (আঃ ৫৭০-৬৩২ খ্রী) : জীবনী ও বাণী

ইসলামের প্রবর্ত্তক হজরৎ মহম্মদ ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মক্কার কোরেশ উপজাতিদের এক শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শৈশবেই তিনি পিতা মাতা উভয়কেই হারান। ফলে প্রথমে ঠাকুর্দা ও পরে এক কাকার নিকট তিনি প্রতিপালিত হন। শিক্ষা-

দীক্ষার পরিবেশেই তিনি বড় হন। হিসাবশাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য তিনি খাদিমা নামে এক বিধবা ভদ্র মহিলার ব্যবসা দেখাশোনার ভার পান এবং এই ব্যবসা সূত্রেই মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ ভ্রমণের সুযোগ পান। পঁচিশ বৎসর বয়সে খাদিমার সহিত তাঁর বিয়ে হয়। এভাবে আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন করার পর মহম্মদ তাঁর আসল আগ্রহ ধর্মচর্চায় মন দেন। মক্কার নিকটে এক নির্জন স্থানে তিনি ঈশ্বরের আরাধনা করতেন।

তিনি ইহুদীদের আচার-আচরণ, সমাজ ব্যবস্থা প্রভৃতি দেখে নিজের জাতির জন্য ঐ রূপ এক সমাজ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেন। মহম্মদ খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতিও আকৃষ্ট হন এবং এই দুই ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। অবশেষে চল্লিশ বছর বয়সে তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে ধর্মপ্রচার করবার এক দিব্য আদেশ লাভ করেন। এর ফলে তিনি ইসলাম নামে এক নূতন ধর্মমত প্রচার করেন। এই ধর্মে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ প্রথার স্থান নাই। ইসলামের মূল কথা হল ঈশ্বর অর্থাৎ আল্লা এক এবং অদ্বিতীয়। মহম্মদ নিজেকে ঈশ্বর বলে মনে করেননি বা প্রচারও করেননি। তিনি ছিলেন ঈশ্বর প্রেরিত শেষ পয়গম্বর বা ধর্ম প্রবর্তক। আরব শব্দ ইসলামের অর্থ হল আল্লা বা ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করা। মুসলমান কথাটির অর্থ হল আল্লার নিকট নিজেকে সমর্পণ করা। আল্লার যে সমস্ত উপদেশ মহম্মদের নিকট প্রতীয়মান হত সেগুলি ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ 'কুর-আন' (কোরাণ) এ সন্নিবিষ্ট আছে।

প্রায় বার বৎসর মহম্মদ মক্কায় এই নূতন ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেন। কিন্তু ঠিকমত ফল না পাওয়ায় তিনি ইয়াবিলে চলে যান (৬২২ খ্রীঃ) পরবর্তীকালে এ জায়গাটিরই নাম হয় মদিনা। মহম্মদের মক্কা ত্যাগের সময় থেকেই মুসলমানরা 'হিজরা' অব্দের গণনা করেন। মদিনায় থাকা কালে মহম্মদ ঠিক করেন জোর করেই তিনি স্বজাতির মধ্যে এই ধর্ম প্রচার করবেন। আট বৎসর পর প্রায় দশ হাজার মুসলমান সহ তিনি মক্কায় ফিরে এলেন। মক্কার অধিবাসীরা তাঁর নূতন ধর্ম গ্রহণ

করল। কাবার মূর্তিগুলি ধ্বংস করে ফেলা হল। অবশ্য পবিত্র স্থান হিসাবে এবং কাবার অনুষ্ঠানাদি এই ধর্মে স্থান পেল। ইসলামকে শুধুমাত্র-ধর্ম হিসাবেই দেখা উচিত নয়। একজন মুসলমানের ব্যক্তিগত সবকিছুই ইসলামের অঙ্গীভূত।

তৃতীয় পাঠ

ইসলামের প্রসারের কারণ

হজরৎ মহম্মদের মৃত্যুর (৬৩২ খ্রীঃ) অল্পকালের মধ্যেই ইসলামের এক আশ্চর্য্য বিস্তার ঘটে। মাত্র একশ বছরের মধ্যেই এই ধর্ম এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমদিকে হজরতের দু'একজন শিষ্য এ ব্যাপারে বিশেষ এক ভূমিকা নেন। এদের মধ্যে আবুবকরের নাম সর্বপ্রথমে উল্লেখ করা যায়। তিনিই প্রথম 'খলিফ' অর্থাৎ মহম্মদের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। মহম্মদের পর তিনি দু'বছর বেঁচে ছিলেন এবং ধর্মপ্রচারের জন্য মুসলমানদের মধ্যে এক গভীর উন্মাদনার সৃষ্টি করেন। আবুবকরের পরবর্তী খলিফগণ এই নীতি বজায় রাখেন। ইসলামের এই দ্রুত প্রসারের পিছনে বিশেষ কয়েকটি কারণ লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমত, ইসলামের মূলনীতি অতি সহজ ও সরল। এতে পুরোহিত প্রথা নাই। ফলে এ ধর্মের মূল কথা সাধারণ ব্যক্তিও অতি সহজে বুঝতে ও অনুভব করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এ ধর্মে জাতি বা বর্ণভেদ প্রভৃতির স্থান নাই। মুসলমান সমাজ ধনী, দরিদ্র, সম্রাট ও ভিক্ষুক সকলেই এক সাথে মসজিদে আল্লার উপাসনা করতে পারে। ফলে মুসলমান সমাজে এক সৌহার্দ্যও ভ্রাতৃত্বের ভাব লক্ষ্য করা যায়।

তৃতীয়ত, আরবদেশের মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা ইসলামের প্রসারের অন্য এক প্রধান কারণ মনে করা হয়। এরা ছিল মরুভূমির মানুষ। সুতরাং এদের কৃষির অবস্থা কোনদিনই ভাল ছিল না। অপর

দিকে পাশাপাশি বিত্তশালী দেশগুলির প্রতি তাদের আকর্ষণ ছিল বিরাট। ধর্ম ও রাজ্য প্রসারের মাধ্যমে এ সকল সুযোগ সুবিধা তাদের
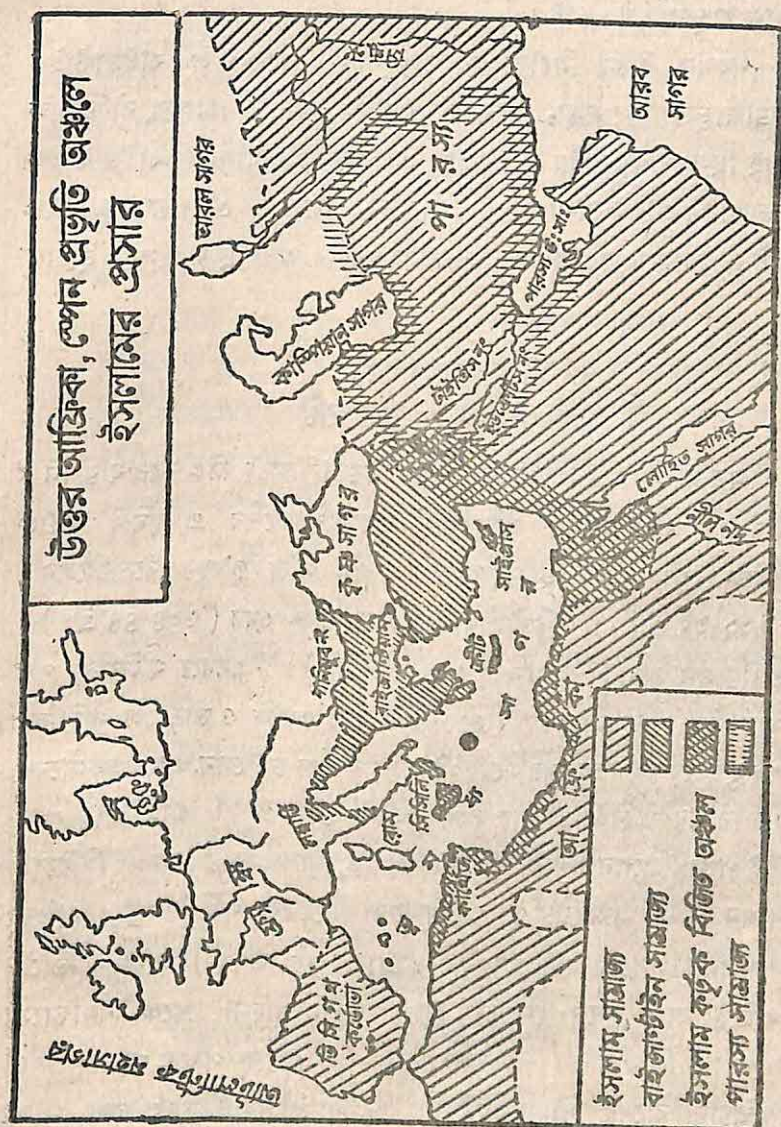
হস্তগত হওয়ার আশা ছিল। ফলে যুদ্ধের দ্বারাও এদেশগুলি জয় করা তাদের প্রয়োজন ছিল।

চতুর্থত, মরু অঞ্চলের অধিবাসী হিসাবে আরবরা ছিল অতিশয়

কষ্টসহিষ্ণু। সুতরাং যুদ্ধের সকল কষ্ট তাদের কাছে পীড়াদায়ক ছিল না। একারণে ইসলামের প্রসারের জন্য যুদ্ধ পরিচালনা করা তাদের কোন অসুবিধা হয় নাই।

পঞ্চমত, মিশর সিরীয়া ও পাশাপাশি অঞ্চলগুলি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল সত্য, কিন্তু এদেশগুলির আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি সবই ছিল আরবদেশীয়। সেজন্য এদেশের অধিবাসীরা বাইজান্টাইন সভ্যতার গ্রীক ভাবধারাকে কোনদিনই ঠিকমত গ্রহণ করতে পারে নাই। ফলে এসব অঞ্চলে ইসলামের প্রসার অতি দ্রুত ও সহজ হয়।

চতুর্থ পাঠ
খলিফ পদের সৃষ্টি

মৃত্যুকালে হজরৎ মহম্মদ কোন উত্তরাধিকারী ঠিক করে যায় নি। তাঁর এক নিকট আত্মীয় আবুবকর প্রথমে হজরতের প্রতিনিধি অর্থাৎ খলিফ নিযুক্ত হন। হজরতের পর তিনি মাত্র দু'বছর বেঁচে ছিলেন। (৬৩২-৩৪ খ্রীঃ)। দ্বিতীয় খলিফের নাম হল ওমর (৬৩৪-৪৪ খ্রীঃ)। তৃতীয় জন হলেন ওথ্মান (৬৪৪-৫৬ খ্রীঃ)। এসময়ে খলিফের পদ নিয়ে বিরোধ সুরু হয়। হজরতের জামাই আলি ও তার দল খলিফের পদ হজরতের পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চাইলেন এবং ওথ্মানের হত্যার পর তিনিই এই পদ দখল করেন (৬৫৬ খ্রীঃ)। আলি পাঁচ বছর এই পদে ছিলেন। তাঁর সময়ে এক গৃহযুদ্ধের সৃষ্টি হয়। সিরিয়ার শাসন কর্তা মুয়াইয়া ৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে নিজেকে খলিফ বলে জাহির করলেন। পরের বছর আলির হত্যার পর তাঁকেই সাধারণ ভাবে খলিফ বলে মেনে নেওয়া হল। তিনি মদিনা থেকে দামাস্কাসে রাজধানী নিয়ে যান। এ সময় থেকে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত খলিফের পদ ওম্মিয়াদ্ বংশেই সীমাবদ্ধ ছিল। ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে হজরৎ বংশ জাত আবুল আব্বাস খলিফ দ্বিতীয় মোরওয়ানকে হত্যা করে এই পদ দখল করে নেন। এইভাবে খলিফের পদ আব্বাসিদ বংশের হস্তগত হয় এবং রাজধানী বাগদাদে স্থানান্তরিত হয়। এ বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফ

ছিলেন হারুণ-অল-রসিদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রীঃ)। তাঁর আমলের বাগদাদের ইতিহাস সুবর্ণযুগ নামে পরিচিত।

এদিকে ওম্মিয়াদ্ বংশের জনৈক আব্দার রহমান ৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কর্ডোভায় (বর্তমান স্পেন) নূতন রাজধানী ও বংশানুক্রমিক খলিফ পদের সৃষ্টি করেন। বলা বাহুল্য স্পেনে পশ্চিম গথদের শাসনের অবসান ঘটিয়েই মুসলমানদের শাসন সম্ভব হয়েছিল। মুসলমানরা স্পেনে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতির সূচনা করে। ফলে মুসলমান অধিকৃত স্পেনের রাজধানী কর্ডোভায় এক নূতন সংস্কৃতি ও সভ্যতার সূচনা হয়। কর্ডোভার মত সুন্দর শহর আর ছিল না। এর লোক সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ। এখানে বহু মস্‌জিদ, স্নানাগার প্রভৃতি নির্মিত হয়েছিল ও কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউরোপের নানা জায়গা থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভ করতে আসত। এর খ্যাতি বহু দূর দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। স্পেনের বহু মসজিদের মত কর্ডোভার মসজিদ এখনও দর্শকদের বিস্ময় উৎপাদন করে। এ মসজিদের ছাদ ও গম্বুজ প্রায় এক হাজার তিন'শর মত স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

কর্ডোভার কারিগর শিল্পেরও যথেষ্ট খ্যাতি লাভ ঘটেছিল। চামড়া, হাতীর দাঁতের কাজ ও কার্পেট প্রভৃতির যথেষ্ট চাহিদা ছিল। খলিফ তৃতীয় আব্দার রহমান ও দ্বিতীয় আল হাকাম শিল্প সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আল হাকামের গ্রন্থাগারে কয়েক লক্ষ বই ছিল।

ইসলাম ধর্ম ও সভ্যতার সাথে ইউরোপের যোগসূত্র স্থাপনে কার্ডোভার অবদান কম ছিল না।

পঞ্চম পাঠ

আরব সাম্রাজ্য ঃ শাসন ব্যবস্থা, সভ্যতা

হজরৎ মহম্মদ মারা যাওয়ার মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই পারস্য, মিশর, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি অঞ্চল আরবদের দখলে আসে এবং একশ বছরের মধ্যেই ভারতের সিন্ধু দেশও তাদের কবলিত হয়। পশ্চিম দিকে স্পেন ও উত্তর আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়।

পশ্চিমের রাজ্যগুলি অধিকাংশই আগে পারস্য ও বাইজান্টাইন্ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরবরা এ সকল অঞ্চলে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থাই চালু রাখে। সংস্কৃতির ব্যাপারেও ঠিক একই কথা বলা চলে। মিশর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন গ্রীক সভ্যতার অংশ ছিল। সাসানিদ্ আমলে পারস্যের নিজস্ব এক সভ্যতা ছিল। এছাড়া খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাবে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিশরে এক বিশেষ ধরণের সাহিত্য ও শিল্পের সৃষ্টি হয়েছিল। আরবরা এই সভ্যতার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে কোন বাধা সৃষ্টি করেনি। উপরন্তু জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তারা উৎসাহ ও সমর্থন জানিয়েছিল এবং ধর্মের স্বাধীনতা ও স্থানীয় লোকদের প্রতিভাকে তারা উৎসাহ দিয়েছিল।

দুটি ব্যাপারে আরবদের আবার অবদান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রথমটি হল ধর্ম ও দ্বিতীয়টি ভাষা। মক্কায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মুসলমান তীর্থযাত্রীদের মধ্যে মিলন ও চিন্তাধারার বিনিময় ঘটে। ধর্মের মত আরবী ভাষাও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত করে। কোরাণের মাধ্যমে আরবী ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষায় পরিণত হয়।

অর্থনৈতিক দিক থেকেও অন্তর্দেশীয় শুল্ক প্রভৃতি শিথিল হওয়ার ফলে সাম্রাজ্যের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ ঘটে। এভাবে মুসলমান বণিকগণ সিংহল ও ভারতের পশ্চিম উপকূলের দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ গড়ে তোলে এবং পরে সুদূর চীনদেশের ক্যান্টন অঞ্চলেও এই রকম যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

বাণিজ্য ছাড়া কৃষির উন্নতির ব্যাপারেও আরবদের প্রচেষ্টা কম ছিল না। মিশরে জল সেচের ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আলোচনা করলে দেখা যায় ভারতের হিন্দু পণ্ডিতদের কাছ থেকে আরব পণ্ডিতরা অঙ্ক, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতির ব্যাপারে বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন। আবার গ্রীকদের কাছ থেকে হিন্দুরা জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, তর্ক ও রসায়ন শাস্ত্র প্রভৃতিতে জ্ঞান লাভ করেন।

আব্বাসিদ বংশীয় হারুণ অল রসিদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রীঃ) ও আল্ মামুন (৮১৩-৩৩ খ্রী) প্রভৃতি খলিফদের আমলে গ্রীকদেশীয় জ্ঞান বিজ্ঞান আরবী ভাষায় অনুবাদের কাজ সুরু হয়। ইতিপূর্বে মেসোপটেমিয়া ও পারস্যে সংস্কৃত ও গ্রীকভাষা হ'তে অনুবাদের কাজ সুরু হয়েছিল। খলিফ আল্ মামুন বাগদাদে অনুবাদের কাজে এক গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেন এবং অনুবাদের কাজে এদের ভারত ও কনস্টান্টিনোপলে পাঠান। বাগদাদে এই অনুবাদক গোষ্ঠীর মধ্যে হুনায়েন ইবন ইসাক (৮০০-৭৭ খ্রীঃ) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হুনায়েনের পরবর্তীকালে তাঁর ধারা অব্যাহত ছিল এবং তাঁরই ধারায় অল্ রাজী নামে জনৈক পারসী বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। অল্ রাজীকেই মুসলমান জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলা হয়।

মধ্যযুগের রসায়ণ শাস্ত্র সাধারণত অপরসায়ণ শাস্ত্র নামে পরিচিত। এই শাস্ত্রের বহু বই গ্রীক হতে সিরিয়া ও আরবী ভাষায় অনূদিত হয় এবং জাবিরকেই আরব অপরসায়ণ শাস্ত্রের জনক বলা হয়।

পদার্থবিদ্যায় আরবজগতে অল্কিন্দির নাম অমর হয়ে আছে। দৃষ্টি ও আলোক শক্তি প্রভৃতি বিজ্ঞানের শাখায় মুসলমানদের বিশেষ খ্যাতি ছিল। গণিত শাস্ত্রে আল্-হাজেন, কামালউদ্দিন প্রভৃতি মনীষীদের দক্ষতা ইউক্লিড ও টলেমিকেও নিষ্প্রভ করেছিল।

আরব দর্শনশাস্ত্র মূলত প্লেটো, এরিষ্টটল ও প্লটিনিয়াসদের দর্শনের সংমিশ্রণ বলা যায়। আরবদের জ্ঞানচর্চা সাধারণত সেমাইটদের ধর্মের উদ্ঘাটিত রহস্য সমূহ, গ্রীক দর্শন এবং গ্রীক ও হিন্দু জ্ঞান বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ বলা যায়।

আরব সাহিত্য বলতে আমরা সাধারণত 'আরব্য রজনীর' সুন্দর উপাখ্যানগুলিকে মনে করি। হারুণ অল্ রসিদের আমলে বাগদাদের সভ্যতার প্রতিচ্ছবি এই উপাখ্যানগুলিতে পাওয়া যায়। ওমর খৈয়ামের রুবায়েতও আরব সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

আরবদের সঙ্গীত পশ্চিমের সঙ্গীতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত

করেছিল। জ্ঞানচর্চার মতই আরব শিল্পকলায় অতি উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। ইসলামের স্থাপত্য শিল্পে বিশেষত মসজিদ নির্মাণে, মিনার, গম্বুজ, প্রচারবেদী প্রভৃতির পরিকল্পনায় ও রং-এর ব্যবহারে যে পরিচয় পাওয়া যায় তা অতুলনীয় বলা চলে।

ধর্মযুদ্ধের আগে ইউরোপের স্পেন ও সিসিলিতে মুসলিম সভ্যতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কর্ডোভা ও সেভিলিকে এই কারণে পশ্চিমের বাগদাদ বলা হয়।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Object Type Questions)

এক কথায় উত্তর দাও :—

১। কোন্ অঞ্চলের লোকদের আরব বলা হয় ?

২। বেদুইন কাদের বলা হয় ?

৩। হজরত মহম্মদ যে ধর্মপ্রচার করেন তার নাম কি ?

৪। প্রথম খলিফের নাম কি ?

সঠিক উত্তরটির উপর √ চিহ্ন দিয়া বুঝাইয়া দাও :—

১। হজরত মহম্মদের জন্ম ৫৫৯/৫৬০/৫৭০/৫৮৫ খৃষ্টাব্দ

২। হজরত মহম্মদের মৃত্যু ৬২৭/৬৩২/৬৩৯/৬৫০ খৃষ্টাব্দ

৩। দ্বিতীয় খলিফ ওসমান/ওমর/আলি

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer Type)

১। হজরত মহম্মদের জন্মকালে আরবদেশে কোন সুসংগঠিত রাষ্ট্র ছিল কি না ?

২। কোরাণে কি ধরনের উপদেশ লেখা আছে ?

৩। কি কারণে হজরত মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যান ?

৪। কি ভাবে খলিফ পদের সৃষ্টি হয়েছিল ?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন (Short Essay Type)

১। হজরতের জীবনী ও বাণীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। ইসলামের দ্রুত প্রসারের কারণগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। 'খলিফ' পদের সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। আরব সাম্রাজ্যের শাসন ও সভ্যতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ (৮০০-১২০০)

(ক) শার্লামেন (৭৬৮-৮১৪ খ্রীঃ)

৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে পটিয়ার্সের যুদ্ধে চার্লস মার্টেলের কাছে মুসলমানরা হেরে যায়। ফলে ফ্রান্স ও পশ্চিম ইউরোপে ইসলামের প্রসার বন্ধ হয়। চার্লস মার্টেলের পুত্র তৃতীয় পেপিন ৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে সে সময়ের ফ্রান্সের রাজা তৃতীয় চিলাডারিককে সিংহাসন চ্যুত করে ক্ষমতা দখল করেন এবং ফ্রান্সে ক্যারোলিজিয়ন্ নামে নূতন এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই পেপিনের পুত্রই হল শার্লামেন (মহৎ চার্লস)। তিনি ৭৬৮ থেকে ৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর আমলে বেশ কয়টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে।

শার্লামেন

প্রথম পাঠ

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পত্তন

৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের সময় থেকে পোপের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বাড়তে থাকে। এর কারণ হল কন্স্টান্টিনোপল থেকে সম্রাট (বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য) পোপের সম্পত্তি বা রোমের রক্ষণাবেক্ষণের দিকে নজর দিতে পারতেন না। ফলে পোপকেই শাসন তথা আক্রমণকারীদের বাধা দেওয়া সব দায়িত্বই নিতে হয়। জাস্টিনিয়ান ইটালী পূর্ণদখল করেছিলেন এবং এক ডিউকের হাতে

শাসনের ভার দেন। এর ফলে পোপ অসম্মানিত বোধ করেন এবং সেই সময় থেকে তিনি এই অধীনতা থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা সুরু করেন। ইটালীতে লম্বার্ড আক্রমণ এ ব্যাপারে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে।

পোপ প্রথম গ্রেগরীর আমলে (৫৯০-৬০৪ খ্রীঃ) লম্বার্ডরা উত্তর ইটালী দখল করে এবং মধ্য ইটালীতে পোপের অধিকারভুক্ত অঞ্চলগুলিতে এই আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দেয়। সম্রাটের কাছ থেকে

ঠিকমত সাহায্য না পাওয়ায় তার প্রতি পোপের ঘৃণা বেড়ে যায়। পোপ দ্বিতীয় গ্রেগরীর আমলে (৭১৫-৩১ খ্রীঃ) আবার লম্বার্ড আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দেয়। এ সময় পোপ লম্বার্ডদের সাথে বন্ধুত্ব করেন ও সম্রাটের কর আদায় প্রভৃতিতে বাধা দেন। লম্বার্ডরা প্রতিদান স্বরূপ পোপকে কিছু অঞ্চল দান করে। লম্বার্ডদের সাথে এই বন্ধুত্ব অবশ্য প্রয়োজনের খাতিরেই হয়েছিল। ইটালীতে পোপের প্রকৃত বিপদ ছিল এই লম্বার্ডরা বাইজাণ্টাইন সম্রাট নয়। এই কারণে পোপ তৃতীয় গ্রেগরী (৭৩১-৪১ খ্রীঃ) লম্বার্ডদের বিরুদ্ধে ফ্র্যাঙ্কদের সাথে বন্ধুত্ব সুরু করেন। পটিয়ার্সের যুদ্ধখ্যাত ও মেয়র চার্লস মার্টেল এ সময় ফ্রান্সের রাজা ছিলেন না সত্য, কিন্তু তাঁর হাতেই ছিল দেশের শাসন ও সামরিক ক্ষমতা। পোপ তাঁর উপর রোমের কর্তৃত্বের ভার দিতে রাজী ছিলেন। বিনিময়ে তিনি লম্বার্ডদের বিরুদ্ধে মার্টেলের সাহায্য চাইলেন। মার্টেল এ ব্যাপারে সাড়া দিলেন না। কিন্তু তাঁর পুত্র তৃতীয় পেপিন (পেপিন দি সর্ট) ফ্রাঙ্কদের রাজা তৃতীয় চিলডারিককে সিংহাসন চ্যুত করে ক্ষমতা দখল করেন এবং সেজন্য তিনি পোপের সমর্থন চাইলেন। পোপ অবশ্যই তাকে সমর্থন করলেন এবং তিনি এই ব্যাপারে বিরাট এক তাৎপর্য্য দেখতে পেলেন--রাজার সিংহাসন লাভে পোপের অনুমতি গ্রহণ। লম্বার্ডরা এ সময়ে আবার ইটালী আক্রমণ করে এবং সমগ্র উত্তর ও উত্তর-মধ্য ইটালী দখল করে তারা রোমের কাছে উপস্থিত হয়। পোপ পেপিনের আশ্রয় প্রার্থনা করলেন এবং পেপিনকে তিনি রাজা হিসাবে স্বীকৃতি দিলেন। পেপিনও যথারীতি তাকে সাহায্য করলেন। লম্বার্ডদের হারিয়ে দিয়ে তিনি পোপকে হৃত রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন। পেপিনের পর শার্লামেনের আমলে লম্বার্ডরা আবার ইটালী আক্রমণ করে। শার্লামেন লম্বার্ডদের সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে দেন এবং তিনি লম্বার্ড-রাজ উপাধি গ্রহণ করেন। এ সাহায্য ছাড়াও পোপ তৃতীয় লিও এক গৃহ বিবাদের ফলে গুরুতর রূপে আহত হন এবং পালিয়ে গিয়ে শার্লামেনের কাছে আশ্রয় পান। শার্লামেন তাকে পুনরায় তার পদে

অধিষ্ঠিত করেন। শার্লামেনের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতই হোক বা পশ্চিম-ইউরোপে তার সম্রাট হওয়ার সম্ভাবনা দেখেই হোক ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের বড় দিনের অনুষ্ঠানে পোপ তাঁকে সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত করলেন। এই ভাবে পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের পত্তন হ'ল ও শার্লামেন এই সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট হলেন।

দ্বিতীয় পাঠ

অভিষেকের গুরুত্ব

শার্লামেনের সম্রাট পদে অভিষিক্ত হওয়ার ঘটনাকে মধ্যযুগের ইহিসাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনে করা হয়। এর প্রথম কারণ হল এ ঘটনার ফলে সাম্রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা তথা রোমান সভ্যতার পুনঃস্থাপন হয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক একতার এক ভাব এর দ্বারা অবশ্যই সূচিত হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পর পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য বলতে কিছুই ছিলনা। এই অভিষেকের ফলে রোমান সাম্রাজ্যের পুনঃস্থাপনা হয় বলা চলে।

তৃতীয়ত, জার্মান বংশোদ্ভব শার্লামেনের নেতৃত্বে এই সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপনের ফলে জার্মান জাতির মর্যাদা বেড়ে যায়।

চতুর্থত, এই ঘটনায় পোপের এরূপ সম্রাটপদ দান করবার অধিকার ও জনসাধারণের দ্বারা সম্রাটের মনোনয়নে অংশ গ্রহণ প্রভৃতি প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত ছিল। পোপের সঙ্গে সম্রাটের অর্থাৎ ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের প্রশ্ন পরবর্তীকালে এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে।

অনেকেই মনে করেন যে এই অভিষেকের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল কনস্টান্টিনোপলের সম্রাটের সঙ্গে শার্লামেনের সম্পর্কের প্রশ্ন। ৮১২ খ্রীষ্টাব্দে বাইজান্টাইন সম্রাট শার্লামেনকে পশ্চিমের সম্রাট বলে মেনে নেন। ফলে এই সময় থেকে রোম সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিম দু'ভাগে সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বাধীন হয়। রোমান চার্চ পূর্ব রোম সাম্রাটের অধীনতা থেকে মুক্তি পায়।

তৃতীয় পাঠ

রাষ্ট্র ও চার্চ

মধ্যযুগের অন্যান্য রাজাদের মত শার্লামেনের ব্যক্তিগত ইচ্ছাই ছিল তাঁর রাষ্ট্রের আইন ও শাসনের মূল ভিত্তি। কিন্তু তিনি অত্যাচারী রাজা ছিলেন না। প্রজাদের মঙ্গল সাধনই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তাঁর রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল পুরোপুরি দিব্যতান্ত্রিক ; অর্থাৎ ধর্ম বা ঈশ্বর সংক্রান্ত বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। অগষ্টাইনের ভাবধারায় তিনি পৃথিবীকে 'ঈশ্বরের শহরে' পরিণত করতে চেয়েছিলেন। এর ফলে ধর্ম ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তাঁর কাছে কোন প্রভেদ ছিলনা।

যদিও কাউন্ট ও বিশপ উভয়ের পরিধি ছিল আলাদা, কিন্তু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একে অপরের পরিপূরক হিসাবেই কাজ করত। ফলে ধর্ম ও বৈষয়িক দিক প্রায় একই শাসনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

শার্লামেন ধর্মকে সরকারের এক বিভাগে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে শাসন কাজের সাথে ধর্ম ব্যবস্থার সব কিছু দেখা শোনা করা সম্ভব ছিলনা। সেজন্য পোপকে তিনি এ ব্যাপারে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সুতরাং সম্রাট কোনক্রমেই পোপের অধীন ছিলেন না। সরকারী শাসন ব্যবস্থার মত চার্চ সংগঠনও তিনি নিজের কর্তৃত্বধীনে রেখেছিলেন। ফলে তাঁর আমলে চার্চ সংগঠন ও পোপের পদ সম্রাটের অধীনস্থ ছিল। পোপ তাঁকে সম্রাট পদ দিয়েছিলেন সত্য কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই পোপ সম্রাটকে নিয়ন্ত্রণ করতেন না। অভিষেকের পর সম্রাট বার বছরের বেশী সকল নাগরিকদের কাছ থেকে এক শপথ আদায় করেন। এ শপথের মূল কথা হ'ল দেশের প্রতি নাগরিকই তাঁকে রাষ্ট্র ও চার্চের প্রধান বলে মনে করবেন। শার্লামেন তাঁর সাম্রাজ্যকে রোমান শাসন ব্যবস্থার ভাবধারা এবং সেই সাথে খ্রীষ্টান ধর্মের পবিত্রতার এক আবরণ দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই কারণে তাঁর সাম্রাজ্য পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য নাম লাভ করে।

চতুর্থ পাঠ

শিক্ষা ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা

রাজ্য জয়, খ্রীষ্টান ধর্ম প্রসার ও সম্রাট উপাধি লাভ প্রভৃতি ছাড়াও শার্লামেনের অপর এক বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষার প্রতি আস্থা। এ যুগে তিনিই রাজধর্মের এক নূতন দায়িত্ব ও তার সুষ্ঠু রূপায়নের কথা চিন্তা করতেন। তিনি মনে করতেন প্রজাদের রক্ষা করার সঙ্গে তাদের সুশিক্ষা দেওয়াও রাজার দায়িত্ব। তাঁর আগের রাজারা রাজ্যকে এক সম্পত্তি বলেই মনে করতেন; প্রজাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা কল্পনাও করেন নাই। শার্লামেন কিন্তু রোমের সভ্যতা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রজাদের সুশিক্ষার কথা বিশেষভাবে অনুভব করেন। ফলে পোপেরা এতদিন যা করতে চাইছিলেন শার্লামেনের আমলে তার বাস্তব রূপায়ণের আশা দেখা দিল। আগেই বলা হয়েছে শার্লামেন রোম-সভ্যতা পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টিত ছিলেন। রোমান আমলের প্রায় সব রকম শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা লোপ পেয়েছিল। এদিকে তাঁর নিজদেশ ফ্রান্সে এ সময় সে ধরণের পণ্ডিত ব্যক্তিদের অভাব ছিল। এই কারণে বাইরের দেশ থেকে ফ্রান্সে তিনি অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিয়ে আসেন। যে সব পণ্ডিত ব্যক্তি এ সময় তাঁর রাজসভায় আসেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইটালীর বৈয়াকরণিক পিটার, লম্বার্ড ঐতিহাসিক পল, স্পেন থেকে ভিসিগথ থিয়োডলফ, ইংল্যাণ্ডের ইয়র্ক অঞ্চল থেকে এলকুইন।

এই সব পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমাগমে আকেন নগরীকে দ্বিতীয় রোম বলে মনে হতে লাগল এবং পুরাণ যুগের হিব্রু, গ্রীক, রোমান ভাষা ও সাহিত্য যেন তাদের আগের জীবন ফিরে পেল।

(খ) আশ্রম প্রথা

পঞ্চম পাঠ

সন্ন্যাস জীবন

সন্ন্যাস জীবন (মনাষ্টিসিজম্) কে এক কথায় খ্রীষ্টান ধর্মের উৎপত্তির পরবর্তীকালে এর মধ্যে যে অনাচার দেখা দেয় তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বলা যায়। নিউ টেস্টামেন্টে বর্ণিত খ্রীষ্টান ধর্মের সারল্য এবং

এর বিপরীত দিকে ধর্মের নানারূপ বাধ্যবাধকতা, বৈষয়িকতা বহু ধর্ম পিপাসুর মনে একরূপ বিরক্তি ও বৈরাগ্য সৃষ্টি করে। ফলে অনেক ব্যক্তি সংসার থেকে দূরে, নির্জনে, একা, কঠোরতার মধ্যে ভগবানের আরাধনা সুরু করেন। সন্ন্যাস প্রথা অবশ্য খ্রীষ্টান ধর্মেই প্রথম নয়। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি প্রায় সব ধর্মেই এর অস্তিত্ব দেখা যায়।

খ্রীষ্টান ধর্মের উৎপত্তির মতই ধর্মের এই বিশেষ প্রথার উৎপত্তিস্থলও পূর্বদেশে। পরে পশ্চিম ইউরোপেও এর বিস্তার ঘটে। প্রথম দিকে এই প্রথার মূল আদর্শ ছিল প্রার্থনা ও উপবাস ইত্যাদির দ্বারা আত্মাকে শুদ্ধ করা। মহিলারাও এ রকম জীবনে নিজেদের উৎসর্গ করতেন।

সন্ন্যাস জীবন থেকে আশ্রম প্রথার উদ্ভব দেখা যায় এবং সেন্ট এন্থনীকে খ্রীষ্টান আশ্রম প্রথার সর্ব প্রথম বলে ধরা হয়। সেন্ট এন্থনীর বন্ধু এথেনেসিয়াস এই প্রথা ইটালীতে চালু করেন এবং ল্যাটিনে সেন্ট এন্থনীর জীবনী লেখা হয়।

প্রথমদিকে সন্ন্যাসীরা শুধুমাত্র শারিরীক কঠোর অভ্যাসের মধ্যেই মুক্তির পথ খুঁজত এবং কোনরূপ বিধিবদ্ধ আইন কানুন বা সংগঠন প্রভৃতির প্রতি উৎসাহ দেখাত না। চতুর্থ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগে ইটালীতে বহু সন্ন্যাসী ও তাদের আশ্রম দেখা যায়। কিন্তু তার

সাধারণভাবে অর্থাৎ প্রথা হিসাবে সকলের পক্ষে প্রযোজ্য কোন নিয়ম বা আইন কানুন তৈরী করেনি। ষষ্ঠ শতাব্দীতে সেন্ট বেনেডিক্টের আবির্ভাব না হওয়া পর্য্যন্ত ইউরোপে সন্ন্যাস তথা আশ্রম প্রথায় ঠিকমত নিয়ম শৃঙ্খলা আসেনি। সেন্ট বেনেডিক্ট কেবলমাত্র সন্ন্যাসীদের কথাই ভাবেননি। সাধারণভাবে তিনি সকল খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের কথা এবং তারা যাতে ধর্মের নির্দেশগুলি ঠিকমত বুঝতে ও জীবনে রূপায়িত করতে পারে তার জন্য তিনি কয়েকটি নিয়ম তৈরী করেন। সন্ন্যাসীদের নিয়মাবলীর ব্যাপারে তাঁর প্রথম কথা হল কাজের আজ্ঞানুবর্তিতা অর্থাৎ কাজের জন্য আদেশ মেনে চলা। তাঁর দ্বিতীয় কথা হল ঈশ্বর ও সমাজের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা। বেনেডিক্টের নিয়মাবলী আমরা আজকের যুগের খ্রীষ্টান মিশনারীদের কাজের সাথে তুলনা করতে পারি।

মঙ্ক (ভিক্ষু)

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে লম্বার্ডদের আক্রমণের সময় বেনেডিক্ট সম্প্রদায়ীরা রোমে আশ্রয় নেয়। পোপ প্রথম গ্রেগরী এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ফলে এই দুই প্রতিষ্ঠানের একীকরণ ঘটে।

বেনেডিক্টের আদর্শে সন্ন্যাসীদের আশ্রমগুলি জ্ঞানচর্চার পটভূমি হওয়ার কোন পরিকল্পনা ছিলনা। কিন্তু পরের আমলে এগুলি জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। এ ব্যাপারে ক্যাসিডোরাসের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এ থেকে দেখা যায় সন্ন্যাসীরা যে আদর্শ নিয়ে সংসার ত্যাগ করে নিজেদের মুক্তির সন্ধান করবেন ভেবেছিলেন তা পরে জনকল্যাণমূলক কাজে রূপায়িত হয়।

ষষ্ঠ পাঠ

ক্লুনি মঠের সংস্কার আন্দোলন

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে সারাদেশে যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি দেখা দেয় তা থেকে এই আশ্রম প্রথাও রেহাই পায়নি। ভাইকিং, নরম্যান প্রভৃতিদের আক্রমণ ও সামন্তদের অর্থলিপ্সা প্রভৃতির ফলে মঠের অনেক সম্পত্তি বেহাত হয়ে যায়। এ সময়ে মঠ পরিচালনায় অনভিজ্ঞ মহান্তরা মঠের সম্পত্তিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করতেন এবং তারা এসব বিক্রী করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করতেন। ফলে এই দুর্নীতির সমালোচনা সুরু হয় ও সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। বার্গাণ্ডি অঞ্চলে বেনেডিক্ট মতাবলম্বী ক্লুনির মঠ থেকে যে সংস্কার আন্দোলন সুর হয় তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মঠ ৯১০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় এবং সামন্ত, বিশপ প্রভৃতিদের প্রভাব থেকে একে মুক্ত রাখা হয়। পোপের নিয়ন্ত্রনাধীনে এই মঠ অচিরেই আদর্শ মঠ হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করে। বার্গাণ্ডি থেকে এই আন্দোলন ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রায় তিনশ মঠ এর নিয়ন্ত্রনাধীনে আসে। এই সংস্কার আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল চার্চ সংগঠনে স্বাধীন নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন। ফলে মধ্যযুগের ধর্ম ব্যবস্থায় রাজা বা সম্রাটের কর্তৃত্ব এবং অভিজাত ও সামন্তদের প্রভাব নষ্ট হয়।

(গ) যাজকদের অভিষেক সংক্রান্ত প্রশ্ন

সপ্তম পাঠ

পোপ-সম্রাট দ্বন্দ্ব

এযুগে ধর্ম ব্যবস্থার সঙ্গে দেশের শাসন ব্যবস্থা অর্থাৎ পোপের সাথে রাজার সম্পর্কের ইতিহাসে পোপ সপ্তম গ্রেগরী (১০৭৩-১০৮৫খ্রীঃ) ও সম্রাট চতুর্থ হেনরীর (১০৫৬-১১০৬ খ্রীঃ) বিবাদ বিশেষভাবে তাৎপর্য্যপূর্ণ। শার্লামেনের শাসনের মূল ভিত্তি ছিল দেশে শাসন ও ধর্ম বিষয়ে সম্রাটই হবেন সর্বময় কর্তা। পোপকে তিনি সম্রাটের অধীনস্থ হিসাবেই দেখতেন। সপ্তম গ্রেগরী সম্রাটের বদলে নিজেকে

অর্থাৎ পোপকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি তথা দেশের শাসন ও ধর্ম দুই ব্যাপারেই সার্বভৌম বলেই মনে করতেন। তাঁর এই মনোভাবের জন্যই সম্রাটের সঙ্গে পোপের ঝগড়া সুরু হয়। ১০৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সম্রাট কর্তৃক চার্চ কর্মচারীদের দণ্ড ও আংটি দিয়ে অভিষিক্ত করার প্রথা নিষিদ্ধ করে দেন। পোপের এই কাজ সম্রাট অগ্রাহ্য করলেন। পোপও এর ফলে সম্রাটকে ধর্মচ্যুত করবেন বলে ভয় দেখালেন। পরের বছর হেনরী জার্মান বিশপদের এক সভায় পোপের বিরুদ্ধে এক নিন্দা প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলেন। পাল্টা জবাব হিসাবে পোপও সম্রাটকে ও অন্যান্য যে সব বিশপ সম্রাটের সাথে ছিলেন তাদের ধর্মচ্যুত করলেন। ঐ বছর (১০৭৬) অক্টোবর মাসে হেন্‌রী জার্মান রাজাদের এক সভা ডাকলেন। কিন্তু এই সভায় উপস্থিত রাজারা ঠিক করলেন যে পরের বছর (১০৭৭) ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে হেনরী তার ধর্ম ফিরে না পেলে তারা আর তাকে সম্রাট বলে মানবেন না। ফলে হেনরী অত্যন্ত অপমানকর পরিস্থিতিতে পোপের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হলেন। পোপ সম্রাটের উপর থেকে তাঁর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন এবং সম্রাট পোপের কর্তৃত্ব মেনে নিলেন। কয়েক বছর পর অবশ্য হেনরী পোপের উপর চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং তাঁকে রোম পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেন।

(ঘ) একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী

অষ্টম পাঠ

শিক্ষা ব্যবস্থা

বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ক্যাথলিক চার্চকে বাদ দিলে মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠন, শিক্ষব্যবস্থা প্রভৃতির মত অন্য আর কোন ব্যবস্থাই পরবর্তীকালকে এত প্রভাবিত করতে পারে নাই। বলতে গেলে সে যুগের বিশ্ববিদ্যালয় ও তার শিক্ষা প্রণালী আজ পর্য্যন্ত প্রায় অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হওয়ার আগে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রধানত মঠ ও

চার্চের দ্বারাই পরিচালিত হত। গ্রামে যাজকরাই মূলত ধর্মসংক্রান্ত উপদেশের মধ্যে এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখতেন। অন্যদিকে আবার সামন্তরাও এ ব্যাপারে কিছু ভূমিকা গ্রহণ করতেন। তবে বলতে গেলে যারা সাধারণত চার্চের কাজে নিযুক্ত হওয়ার আশা পোষণ করতেন তাদের ছোটবেলা থেকেই একরকম শিক্ষা নেওয়ার ধারা প্রচলিত ছিল। অভিজাত শ্রেণীরা এ ব্যাপারে খুব মাথা ঘামাতেন না। ফলে শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও যাজক সম্প্রদায়ের ভেতর থেকেই কর্মচারী খুঁজে বের করতে হত। কিন্তু মঠ বা চার্চের শিক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে দেশের শাসন কাজের চাহিদা মত শিক্ষণপ্রাপ্ত লোক যোগান দেওয়া সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে একাদশ শতাব্দী এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে সংস্কার আন্দোলনের কালে চার্চ ও মঠগুলির পক্ষে পরিপূর্ণভাবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে নজর দেওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে চার্চের সাথে জড়িত স্কুলগুলিকে এই দায়িত্ব নিতে হয়। ক্যাণ্টারবেরী, লেয়ন, রিম্‌স, প্যারিস, চারর্টেস, টলিডো প্রভৃতি চার্চ স্কুলগুলির নাম এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য।

এই স্কুলগুলির পঠন পাঠনের ধারা রোম থেকেই নেওয়া। ব্যাকরণ ছন্দ, তর্কশাস্ত্র, অঙ্ক, জ্যামিতি, সঙ্গীত, প্রভৃতি বিষয়গুলি ছিল পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠ্যসূচী আবার বিশেষভাবে বৈষয়িক ও ব্যবহারিক দিক চিন্তা করে তৈরী করা হত।

দ্বাদশ শতাব্দীতে চার্চের অর্থাৎ প্রচলিত ধর্ম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক নূতন মতবাদ দেখা দেয়। ফলে চার্চ সংগঠন ও প্রচলিত ধ্যান ধারণাকে রক্ষা করার জন্য এক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ সময়ে চার্চগুলি সংগঠন প্রভৃতির দিক দিয়ে যে রকম বিশাল আকার ধারণ করে তার জন্য দক্ষ আইনজীবি, চিঠিপত্র, দলিল প্রভৃতি প্রস্তুত করার জন্য ঠিকমত ব্যক্তিদেরও প্রয়োজন দেখা দেয়। এছাড়া আবার সামন্তদের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য দক্ষ শাসক ও ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা জানা লোকের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়। এর উপর নূতন শহর সৃষ্টি হওয়ার জন্য যেমন শিক্ষিত ব্যক্তিদের দরকার হয় তেমন

বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার সুযোগ করে দেবার জন্যও বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয় কথাটি ল্যাটিনে ছাত্র ও শিক্ষকদের মিলিত এক সংগঠনকে বোঝায়। এই ব্যবস্থা পরিচালনের জন্য একজন (চ্যান্সেলার) বা আচার্য্য, একজন উপাচার্য্য, নানা বিভাগে বিভাগীয় প্রধান এবং বিভিন্ন বিষয়ে পঠন, পরীক্ষা গ্রহণ, ডিগ্রীদান প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকে। বর্তমান কালের কলেজগুলির পরিচালনা, শিক্ষাব্যবস্থা ও পরীক্ষা গ্রহণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

ইটালীর বোলোনা শহরে সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়। এখানে আইন অধ্যয়নের যথেষ্ট খ্যাতি শোনা যায় এবং আইনের অধ্যাপক আরণেরিয়াসের সময় মধ্যযুগের ব্যবহার শাস্ত্রের এক বিশেষ ধরণের অধ্যয়ন সুরু হয়। গ্রীস ও রোমের বিজ্ঞান সাধনার ধারা এখানে অব্যাহত রাখা হয়। সিসিলি থেকে আরবদের চিকিৎসাশাস্ত্রেরও জ্ঞান আহরণের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইটালীতে আরও বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

ফ্রান্সের অনেক চার্চ পরিচালিত স্কুল বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে এবং কালক্রমে এদের কেন্দ্রস্থল হিসাবে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হয়। দর্শন, অর্থনীতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা শাখার পীঠস্থান হিসাবে এর খ্যাতি ছড়ায়। আরণেরিয়াসের মত শাঁপু প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিটার এবেলার্ডের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে ঈশ্বরতত্ব, যাজকদের অনুশাসন, চিকিৎসাশাস্ত্র ও শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। এযুগে অপর কয়েকজন শিক্ষকদের মধ্যে রোজার বেকন, টমাস একই নাম আলবার্টম্যাগনাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে ইংল্যাণ্ডে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের পরের স্থানই অধিকার

করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের অপর এক বিখ্যাত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পৃথিবীর নানাদেশের শিক্ষার্থীরা অধ্যয়নের সুযোগ পায় ও এখানের স্নাতকরা যে কোন স্থানে শিক্ষকতার সুযোগ পায়। মনের ঔদার্য্যগত বিদ্যাগুলি যেমন সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি ছাড়াও পেশাগত বৃত্তি হিসাবে আইন, ব্রহ্ম বিদ্যা, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে শিক্ষালাভের সুযোগ ছিল।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions)

১। শার্লামেনের পিতার নাম কি ?
২। বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কোথায় ছিল ?
৩। বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের অন্য নাম কি ছিল ?
৪। চার্লস মার্টেল কি জন্য বিখ্যাত ?
৫। তৃতীয় পেপিন কোন্ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করেন ?
৬। ৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে কোন্ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয় ?
৭। ইউরোপের কোন জায়গায় প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ?

সঠিক উত্তরটির উপর ✓ চিহ্ন দাও :—

১। পটিয়ার্সের যুদ্ধ ৭১৫/৭২৫/৭৩২ খ্রীষ্টাব্দ
২। পোপ প্রথম গ্রেগরীর আমল ৫৮০-৫৯০/৫৯০-৬০৪/৬০৪-৬১৮ খ্রীঃ
৩। শার্লামেনের রাজত্বকাল ৭৩২-৭৬৮/৭৬৮-৮১৪/৮১৪-৮৪২ খ্রীঃ

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer Type)

১। কি কারণে ইউরোপে ইসলামের প্রসার বন্ধ হয় ?
২। ক্যারোলিজিয়ন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা কিভাবে হয়েছিল ?
৩। পোপ কি কারণে তৃতীয় পেপিনের সাহায্য চেয়েছিলেন ?
৪। শার্লামেন কি কারণে প্রজাদের সুশিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন ?
৫। খ্রীষ্টানধর্মে আশ্রমপ্রথা সৃষ্টির কারণ কি ?
৬। ক্লুনির মঠ থেকে সংস্কার আন্দোলনের কারণ কি ?

সংক্ষিপ্ত রচনা ভিত্তিক প্রশ্ন (Short Essay Type)

১। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পত্তনের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
২। শার্লামেনের অভিষেকের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
৩। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে শিক্ষাব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

সপ্তম অধ্যায়

(ক) মধ্যযুগে ইউরোপের সামন্ত প্রথা

প্রথম পাঠ

সামন্ততন্ত্র কাকে বলে ? সামন্ত প্রথার বিভিন্ন দিক

মধ্যযুগে ইউরোপের সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় যে ব্যবস্থা দেখা যায় এক কথায় তাকে সামন্ততন্ত্র বা ইংরেজীতে ফিউডালিজ্‌ম্ বলে। জমির সত্ব, জমিদার প্রজা সম্পর্ক, দেশের শাসন ব্যবস্থা এবং এর সাথে যুদ্ধ প্রভৃতি পরিচালনা এই প্রথারই অংশ বিশেষ।

খ্রীষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে মহান চার্লস (শার্লামেন)-এর সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন দেখা দেয় এবং শাসন ব্যবস্থায় এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ সময় বড় বড় জমিদার বা সামন্ত (লর্ড) ও সরকারী কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার বদলে নিজেরা এক এক জায়গায় স্থানীয় শাসনভার গ্রহণ করে। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক দায় দায়িত্বের মধ্যে বর্বর জাতির আক্রমণ প্রভৃতিকে ঠেকানর দায়িত্বও তাদের উপর এসে পড়ে।

এই সময় দেশে যে নূতন সমাজ, শাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দেখা দেয় তাকে সামন্ততন্ত্র বলে। সাধারণতঃ ৮০০ থেকে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়কে সামন্ততন্ত্রের যুগ বলা হয়।

এ ব্যবস্থায় পূর্বেকার রাজার সাথে প্রজাদের সম্পর্ক বদল হল। রাজাদের প্রায় সব ক্ষমতা সামন্তরা দখল করে নিল। পূর্বে ডাচি, কাউন্টি, মার্চেস্‌গুলি ছিল রাজ্যের অংশ। এখন এগুলিই এক একটি রাজ্য হয়ে দাঁড়াল।

সামন্ত প্রথাকে আজকালকার দিনের শাসন ব্যবস্থার এক ছোট সংস্করণ মনে করা যেতে পারে। এ যুগের প্রধান বৈশিষ্ট হ'ল আগের দিনে রাজারা যেমন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতেন সামন্তরাও তেমনি নিজ নিজ অঞ্চলে ঐরূপ ক্ষমতা দখল করে নিত। আরও

একটি লক্ষ্য করার বিষয় হল এই প্রথায় সামন্ত ও জমিভোগকারী প্রজার সম্পর্ক। কোন লোক সামন্ত (অধিরাজ, লর্ড বা বড় জমিদার)-এর কাছ থেকে চিরকালের মত জমি ইজারা নিতে পারত, বিনিময়ে প্রজাকে তার সামন্তের কাছে পাওনাগণ্ডা, শাসন, বিচার, যুদ্ধ প্রভৃতি সব ব্যাপারে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিতে হত। এই শেষের দায়িত্ব পালন অর্থাৎ যুদ্ধ কালে সামন্তকে সৈন্য সাহায্য প্রভৃতি থেকে সামন্ত প্রথায় সামরিক ব্যাপার দেখা দেয়। এই ছোট জমিদাররা আবার অনেক সময় চাষ করার জন্য নানা লোককে জমি বিলি করতেন। এরূপ অবস্থায় এই ছোট জমিদারদের উপসামন্ত বলা হয়ে থাকে। এ ভাবে সামন্ত বা যারা জমি ইজারা দিতেন এবং প্রজা অর্থাৎ যারা জমি ইজারা নিতেন তাদের মধ্যে এক ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠত। কারণ এ সকল সামন্তরা তাদের এলাকা ও জমিদারী গুলোকে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলেই ধরে নিত। ফলে প্রজাদের আনুগত্য দেশের প্রতি না হয়ে সামন্তের প্রতিই থাকত। বহু জমি গ্রহণকারী এরূপ লোকেদের সাথে সামন্তদের চুক্তি হত এবং জমি গ্রহণকারীরা তাদের আশ্রয়দাতার প্রতি অনুগত থাকার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য থাকত। এ যুগে যে কথাটি সব সময়েই শোনা যেত তা থেকে সামন্তদের সাথে প্রজাদের সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন লোকেরই পরিচয় অন্যভাবে যাই থাক তিনি কার লোক অর্থাৎ কোন জমিদারের অধীন সমাজে এই ছিল তার প্রথম পরিচয়। যেমন একজন কাউন্টের পরিচয় হ'ল তিনি রাজার লোক, আর একজন 'সার্ফ' বললে বুঝতে কোন অসুবিধাই হতনা যে সে একজন জমিদারের ভূমিদাস বিশেষ।

সামন্তদের সাথে প্রজাদের সম্পর্ক এরূপ ব্যক্তিগত ও কয়েকটি শর্তের উপর নির্ভর করত। প্রজারা জমিদারদের অনুগত ও বিশ্বাস ভাজন হয়ে থাকবে। বিনিময়ে সামন্তরা তাদের জমি বা জায়গীর দান করবেন। প্রজাদের অনেক রকম দায়িত্বের মধ্যে (বিশেষভাবে যারা অনেক বড় আকারের জমি বা জায়গীর নিতেন) যুদ্ধ কালে সামন্তকে সৈন্য সাহায্য করতে হত। আর সাধারণ সময়ে সামন্তদের শাসন,

বিচার প্রভৃতি কাজে সাহায্য করতে হত ও সামন্তদের পুত্র কন্যার বিয়ে প্রভৃতিতে উপস্থিত থাকা ও অর্থ সাহায্য প্রভৃতি দিতে হত। সামন্তরাও প্রজার মৃত্যুতে নাবালকের সম্পত্তি দেখাশোনা করত, আবার মৃত প্রজার কোন বংশধর না থাকলে সে জমি অন্য কাউকে বিলি করতেন।

সামন্ত প্রথায় রাজার ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছিল মাত্র। রাজতন্ত্র অবশ্যই টিকে ছিল। সারা দেশের শাসন, বিচার প্রভৃতি ব্যাপারে শেষ কথা বলার অধিকার অবশ্যই তার ছিল।

মধ্যযুগের এই সামন্ত সমাজ ব্যবস্থা তিন শ্রেণী বা এষ্টেটে বিভক্ত ছিল। প্রতি শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের কাজ যথাযথ করবে এরূপ মনে করা হত, আর এই শ্রেণীভাগ বেশ কঠোর ভাবেই বলবৎ করা হত। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে অনেক সময় নানা রকম সম্পর্ক গড়ে উঠত। কারণ অনেক সময় যাজকরাও অনেক বড় বড় ভূসম্পত্তির মালিক হতেন আবার প্রজা হিসাবেও তারা জমি রাখতেন। প্রথম শ্রেণী বলতে যাজক সম্প্রদায়কে বোঝাত, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ত অভি জাত বা বড় জমিদার বা সামন্তরা আর তৃতীয় শ্রেণীতে থাকত সাধারণ লোকেরা যাদের কাজ দিন পরিশ্রম করা। এই সমাজ ব্যবস্থায় জমিকে কেন্দ্র করেই সব কিছু গড়ে উঠেছিল। এরূপ শ্রেণী ভাগও মনে হয় সে যুগের প্রয়োজন ঠিকমত মেটাত, নইলে হয়ত এর চেহারা অন্য রকম হতে পারত।

দ্বিতীয় পাঠ

ইউরোপের প্রতিরক্ষায় সামন্তদের দুর্গ ও সশস্ত্র অশ্বারোহীদের ভূমিকা

সামন্ত যুগের দুর্গগুলি এ কালের স্থাপত্য শিল্পের যথেষ্ট নিদর্শন বহন করে। সামন্ত প্রথার সৃষ্টি বা উৎস খুঁজতে গেলে দেখা যাবে যে সমাজের প্রায় সব স্তরেই নিরাপত্তার প্রশ্ন থেকেই এ ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। তেমনি নিরাপত্তার প্রশ্ন থেকেই এ যুগের দুর্গগুলিরও সৃষ্টি হয়। শার্লামেনের মৃত্যুর পর বহিরাক্রমণ ও দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধ

প্রভৃতির দরুণ জনসাধারণ এক শক্তিশালী রক্ষকের প্রয়োজন বোধ করত। এ যুগের সামন্তরাও নিজেদের জমিদারী সুরক্ষার জন্য অর্থাৎ অপর কোন জমিদার বা অন্য আক্রমণকারী তাদের জমিদারী কেড়ে নিতে না পারে সেজন্য এই দুর্গগুলি নির্মাণ করতেন। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ও হাঙ্গেরিয়ানদের আক্রমণ কালে দেশের বিভিন্ন জায়গায় এভাবে দুর্গ গড়ে উঠে। এই দুর্গগুলির কাছাকাছি অনেক বসতি গড়ে উঠতে থাকে এবং এরা তাদের রক্ষককে নিজেদের সাধ্যমত শ্রম ও অন্যান্য সাহায্য দিতে রাজী হয়।

সাধারণত প্রাকৃতিক দিক থেকে নিরাপদ জায়গাগুলি যেমন পাহাড়ের উপর, নদীর তীর বা তা না হলে কৃত্রিম উপায়ে তৈরী পাহাড়, পরিখার উপরে এই দুর্গগুলি তৈরী করা হত। এগুলি সামন্ত বা লর্ডদের স্বাধীনতা ও শক্তির পরিচয় দিত। প্রথম দিকে এই দুর্গগুলি কাঠ দিয়ে তৈরী করা হত; আর এদের প্রাচীরগুলিতে গোলাগুলী ছোড়ার জন্য গর্ত রাখা হত। পরে কাঠের বদলে পাথর ব্যবহার সুরু হয় এবং দুর্গগুলির চেহারাও পরিবর্তন হয়। পাথর ব্যবহারের ফলে আজকালকার বিরাট উঁচু অট্টালিকার মত এযুগের দুর্গগুলিও উঁচু মিনারের চেহারা নেয়। দুর্গগুলির ভিতরে বহুতল বিশিষ্ট কক্ষগুলিতে বাসস্থান, অতিথিশালা, গুদাম, গ্রন্থাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। এই দুর্গগুলিতেই সামন্তরা তাদের সরকারী কাজ কর্মের কেন্দ্রস্থল হিসাবে ব্যবহার করতেন এবং এখানে তারা অতিথি আপ্যায়ন, হিসাবপত্র দেখাশোনা, সভার কাজ প্রভৃতি চালিয়ে নিতেন। সামন্তরা যখন দুর্গের বাইরে থাকতেন তখন তাদের স্ত্রীদের উপর (সংসারের কাজকর্ম ছাড়াও) দুর্গের কাজ চালাবার দায়িত্ব পড়ত। দুর্গ-গুলির সুরক্ষা ও তার সাথে অন্যান্য কাজকর্ম প্রধানত সামন্তদের অধীন প্রজাদের উপরই দেওয়া হত। প্রজারাও নিজেদের নিরাপত্তার বদলে তাদের উপরওয়ালার আজ্ঞা পালন করত।

আজকালকার মত সে যুগেও যুদ্ধ প্রভৃতির জন্য বহু টাকা খরচ হত। দুর্গগুলির নির্মাণ খরচ ছাড়াও রক্ষণাবেক্ষণ, সৈন্যদের জন্য অস্ত্র, পোষাক,

অশ্ব প্রভৃতির খরচ কম ছিল না। একাদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে ল্যাটিন ভাষার সনদগুলিতে প্রজাদের অনেক ক্ষেত্রে সৈন্য বলে উল্লেখ করা আছে। ফরাসী ভাষায় লিখিত অনেক বইতেও আবার এই সৈন্যদের 'নাইট' বলা হয়েছে। এর কারণ হল সামন্তদের প্রজারাই অশ্বারোহী সৈন্যর কাজ করত, সেজন্য হয়ত 'নাইট' ও সৈন্য শব্দ দুটি একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

এ যুগে পদাতিক সৈন্য অপেক্ষা বর্ম পরা অশ্বারোহী সৈন্যর প্রচলন ও সমাদর ছিল। এর কারণ খুঁজলে দেখা যায় যে মুসলমানদের হাত
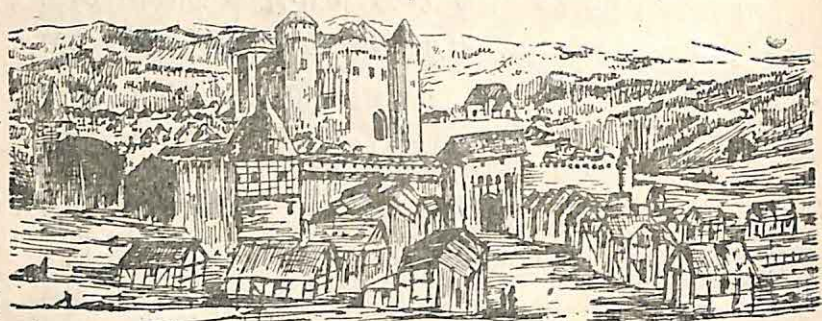
মধ্যযুগের দুর্গ

থেকে দেশরক্ষার জন্য অশ্বারোহী সৈন্যরই প্রয়োজন ছিল বেশী। কথিত আছে আরবদের আক্রমণ থেকে ইউরোপকে রক্ষা করার জন্য চার্লস্ মার্টেল অশ্বারোহী সৈন্য চালু করেন। আক্রমণ প্রতিহত করা ছাড়াও আক্রমণকারীদের পিছু নেওয়ার জন্য অশ্বারোহী সৈন্য সেযুগে সত্যই অপরিহার্য ছিল। অবশ্য চার্লস্ মার্টেলের আগেও ইউরোপে অশ্বারোহী সৈন্যর প্রচলন ছিল। তবে আরবদের যথাযথ মোকাবিলার জন্য এরূপ দ্রুত সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন দেখা দেয় ও কার্যকর করা হয়। চার্লস্ মার্টেল প্রজাদের মধ্য থেকে এক শ্রেণীর অশ্বারোহী সৈন্য সৃষ্টি করেন এবং এই প্রথা ফ্রান্স থেকে দক্ষিণ ইউরোপের বহু অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পাহাড়ী অঞ্চলে এই অশ্বারোহীরাই পদাতিক বাহিনীর কাজ করে। এ ছাড়া গেরিলা যুদ্ধ, দীর্ঘপথ অতিক্রম ও দ্রুত যুদ্ধ ক্ষেত্রে

উপস্থিতি ও পলায়ন প্রভৃতি ব্যাপারে অশ্বারোহী বাহিনীই বিশেষ কার্যকর হয়। ১০৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর চতুর্থ হেনরীর হাতে স্যাক্সনরা যখন হেরে যায় সে সময় অশ্বারোহী বাহিনীর ক্ষিপ্রতার ফলেই বহু জীবন রক্ষা পায়।

তৃতীয় পাঠ
বীরধর্ম (শিভ্‌ল্‌রি)

'ক্যাভ্‌ল্‌রি' (অশ্বারোহী সৈন্য) শব্দটি ল্যাটিন ক্যাবেলাস্‌ (অশ্ব) থেকে সৃষ্টি হয়েছে। মুসলমানদের আক্রমণ থেকে ইউরোপকে রক্ষার জন্য চার্লস্‌ মার্টেল যে অশ্বারোহী সৈন্যর উপর জোর দেন সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। ফ্রান্সের অনুকরণে এই প্রথা ইউরোপের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। সামন্ত প্রথার সঙ্গেও এ প্রথা বিশেষভাবে জড়িত। সুতরাং সামন্ত প্রথার বিস্তৃতির সাথে এরও প্রসার ঘটে।

শিভ্‌ল্‌রি বা বীরত্ব-প্রদর্শনকে সামন্ত প্রথার ফল বা পরিণতি বলা যায়। এ যুগে অভিজাত বা 'নোব্‌লরা' সমাজে এক বিশেষ আধিকার ভোগী শ্রেণী হিসাবেই স্থান পেত। তারা এক পৃথক গোষ্ঠী হিসাবে সাধারণ লোকদের কাছ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখত। সামাজিক স্তরের দ্বিতীয় শ্রেণীতে সামন্ত বা লর্ডদের পরেই ছিল এদের স্থান এবং এরাই লর্ডদের জন্য যুদ্ধ পরিচালনার অধিকার পেত। লর্ডদের প্রতি আনুগত্য, সততা, সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি গুণগুলির যেন এরাই ছিল প্রতিমূর্ত্তি। আভিজাত্যের দিক থেকে এরাই শাসনের ক্ষমতা পেত। যুদ্ধের দায়িত্ব পালন করতে গেলে অবশ্যই যুদ্ধ বিদ্যা শেখার দরকার হত। এ কারণে এ বংশের ছেলেরা কম বয়স থেকেই ঘোড়ায় চড়া, শিকার, যুদ্ধবিদ্যা ও শাসনকাজ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করত। আগেকার দিনে রাজারা যেমন 'ঈশ্বরের দেওয়া ক্ষমতা'র জোরে রাজত্ব করতেন, তেমনই এই 'নোব্‌ল'রাও সমাজে তাদের এক পবিত্র দায়িত্ব আছে বলে মনে করতেন। আর এই দায়িত্ববোধ থেকেই 'শিভ্‌ল্‌রি প্রথার সৃষ্টি হয়। এরই প্রকৃত সংগঠনকে 'নাইটহুড' বলা হয়।

'নাইটহুড' প্রথার সৃষ্টি, অনুষ্ঠান প্রভৃতির বিশদ বিবরণ টেসিটাসের বর্ণনায় পাওয়া যায়। জার্মানীতে প্রথম এই প্রথার উদ্ভব হয়। 'নাইট'রা সমাজে এক বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠী হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার আগে কোন রাজা, লর্ড অথবা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর কাছে শিক্ষা লাভের প্রয়োজন হত। যুদ্ধবিদ্যা, শিকার ও অস্ত্র পরিচালনার নিপুণতা প্রভৃতি এই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া প্রতি নাইটের সততা, সহনশীলতা, দুর্বলকে রক্ষা করা, বয়স্কদের শ্রদ্ধা করা, বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি কয়েকটি চরিত্রের সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়ারও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। নাইটদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাকে সামাজিক এক কর্তব্য বলে মনে করা হত। অভিজাতরা এই শিক্ষাদানের ব্যবস্থাকে তাদের ছেলেদের কর্মজীবনের উন্নতির পথ বলেই মনে করতেন।

মধ্যযুগের নাইট

ধর্মযুদ্ধের (ক্রুসেড) সময় থেকে শিভ্‌ল্‌রির সাথে ধর্মের যোগ হয়। সাধারণভাবে যুদ্ধের সাথে ধর্মের যোগাযোগ অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ অবশ্যই পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করা হত। ফলে এ যুগে প্রতি 'নাইটের' বিধর্মীদের হাত থেকে স্বধর্ম রক্ষা করা এক পবিত্র দায়িত্বের ব্যাপার হয়ে উঠে।

দ্বাদশ শতাব্দী থেকে শিভ্‌ল্‌রির সাথে ধর্ম ছাড়াও আরও এক নূতন বিষয় যোগ হয় এবং তা হল মেয়েদের প্রতি সম্মান দেখান। অসহায়, অত্যাচারিত, অনাথ, বিধবা প্রভৃতিদের রক্ষা করা শিভ্‌ল্‌রির অন্যতম বৈশিষ্ট।

চতুর্থ পাঠ

চারণ কবি (ত্রুবেদর) ঃ

মধ্যযুগে শিভ্‌ল্‌রির (বীরব্রত) অনেক অবদানের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার মত হল ইউরোপে বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি। এই বীরপূজার যুগে বীরদের কীর্তি-কাহিনী জন সাধারণের কাছে অতিশয় উপভোগের ব্যাপার ছিল। ফলে ফ্রান্সে এক ধরণের গীতি-কবিতার বা গানের সৃষ্টি হয়; আর এই গানগুলি নাইটদের নানারূপ বাস্তব ও কাল্পনিক কীর্তি কাহিনীর উপর লেখা হত। ফ্রান্সের দক্ষিণ অঞ্চলে এই জাতীয় গানগুলি যারা রচনা করতেন তারা ত্রুবেদর নামে পরিচিত ছিল। জার্মানীর 'মিনেসিংঙ্গারদের' মত ফ্রান্সের এই 'ত্রুবেদররা' দেশের নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে তাদের লেখা গানগুলি গেয়ে জনসাধারণের মনে আনন্দ জোগাত। রবিন হুড, রাজা আর্থার, বীর রোঁলা ও অন্যান্য বীরদের কীর্তিকাহিনী ছিল এই গানগুলির বিষয়বস্তু। এই গানগুলি ইউরোপের অন্য স্থানীয়ভাষায় অনুকরণের অনুপ্রেরণা দেয়। প্রকৃতপক্ষে পরবর্ত্তী যুগে ইংল্যাণ্ডের গীতিকাব্যের ধারা ফ্রান্সের 'ত্রুবেদরদের' অনুপ্রেরণায় সৃষ্টি বলে অনেকেই মনে করেন। আমাদের দেশের রাজপুত-বীর কাহিনী ফ্রান্সের ত্রুবেদরদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

(খ) জমিদারী প্রথা (ম্যানোরিয়েল সিস্টেম্)

প্রথম পাঠ

ম্যানর বা জমিদারী প্রথা ঃ সামন্ত প্রথার অর্থ নৈতিক দিক ঃ সামন্ত শাসন ব্যবস্থার প্রথম ধাপ

'ফিউডাল' বা সামন্ত প্রথা জমিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। ম্যানর বা জমিদারী প্রথা এই সামন্ত ব্যবস্থার এক অংশ বিশেষ। সামন্ত প্রথার অধীনে গ্রামগুলিকেই সাধারণত ম্যানর বলা হত; আর এই গ্রামগুলিই ছিল সামন্ত ব্যবস্থার প্রথম ধাপ বা 'ইউনিট'। ম্যানর প্রথা বলতে এক কথায় মধ্যযুগে গ্রামে জমি চাষবাস, মজুরদের

প্রতিদিনের জীবনযাত্রা জমিদারের সাথে চাষীর সম্পর্ক প্রভৃতি বোঝায়। এই ম্যানরগুলিতেই জমিদাররা অধিকাংশ সময় থাকতেন ও তাদের বিচারালয় প্রভৃতির মাধ্যমে জমিদারীতে শান্তি শৃঙ্খলা, পাওনা, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি ব্যাপারে নিষ্পত্তি করতেন। জমিদাররা এখানে চাষীদের পরিশ্রম, খাজনা প্রভৃতি নিয়ে বেশ আরামে দিন
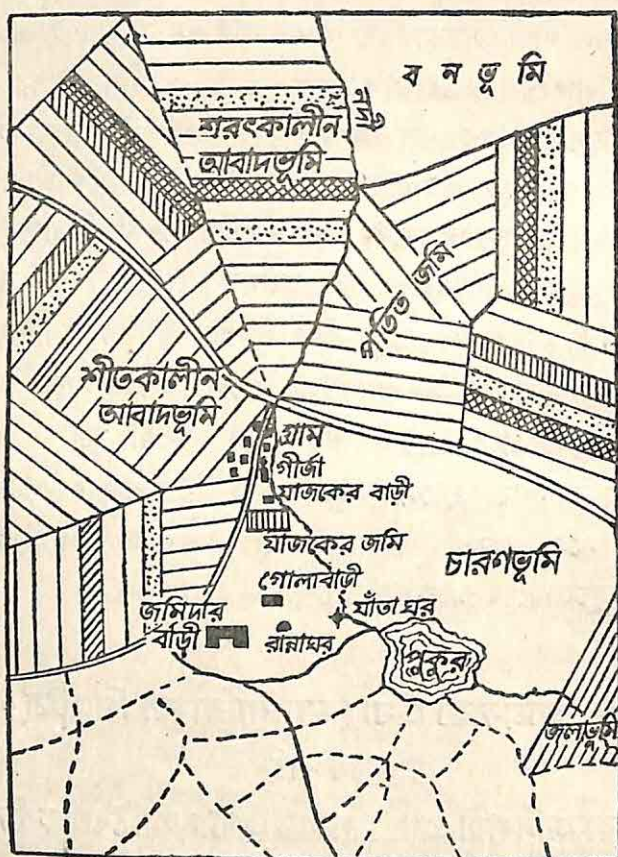
ম্যানরের নক্‌শা

কাটাতেন। বলতে গেলে চাষীদের শারিরীক পরিশ্রমের উপরই সামন্ত-প্রথা দাঁড়িয়েছিল। উৎপত্তি ও প্রাচীনত্বর দিক থেকে দেখা যায় যে এই দুই প্রথা একই কারণে ও একই সাথে সৃষ্টি হয়েছিল। রোমান আমলের জমিদার ও ভূমিদাস প্রথা পরের যুগে জার্মান বসতিগুলির মধ্যে চালু হয়। আগেকার রোমান ভিলা ও জার্মান

আমলের গ্রাম ব্যবস্থাকে এ কারণে ম্যানরগুলির পূর্বসূরী বলা চলে। আবার খ্রীষ্টান ধর্ম প্রসারের সাথে সাথেও ম্যানরগুলির প্রসার ঘটে। এর কারণ হল যাজকদের পল্লীগুলিতে বিস্তীর্ণ চাষ যোগ্য জমি থাকত। ফলে এসব অঞ্চলে যাজকরাও জমিদার হয়ে উঠতেন। এভাবে ইউরোপের প্রায় সব জায়গাতেই ম্যানর প্রথা চালু হয়। স্থানীয় রীতিনীতির প্রভাব বাদ দিলে মৌলিকত্বের দিক থেকে এই প্রথা সর্বত্রই প্রায় একই রকমের ছিল।

ম্যানরগুলি ছিল জমিদারদের সম্পত্তি বা এস্টেষ্ট। জমিদারদের মূল বা প্রধান আয় এই ম্যানরগুলির উপরই নির্ভর করত। এ কারণে এই ম্যানরগুলিকে সামন্ত প্রথার অর্থ নৈতিক কাঠামো বলা উচিত। জমিদারদের ম্যানর সংখ্যার কোন ঠিক ছিল না। কোন কোন জমিদার অনেকগুলি ম্যানরের মালিক হতেন, আবার কাউকে হয়ত একটি ম্যানর নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হত। সাধারণত এক একটি ম্যানরে ন'শ থেকে দু'হাজার একর পর্যন্ত চাষ যোগ্য জমি থাকত। এছাড়াও প্রতি ম্যানরেই তৃণভূমি, চারণভূমি, বনজঙ্গল, পতিতজমি ও জমিদারদের খাসজমি থাকত। এসব মিলিয়েই হ'ত জমিদারের রাজত্ব। খাসজমি (ডিমেইন্) বলতে ম্যানরগুলির আবাদযোগ্য সবচেয়ে ভাল অংশ জমিদাররা নিজেদের জন্য আলাদাভাবে রাখতেন।

দ্বিতীয় পাঠ

ম্যানর হাউস, দুর্গ প্রভৃতিতে জমিদারদের জীবনযাত্রা : ম্যানর কোর্ট

ম্যানরগুলির বেশ ভাল ও উঁচু জায়গায় তৈরী হত জমিদারদের প্রাসাদ বা দুর্গ। এই প্রাসাদগুলি ছোটখাটো দুর্গের মত। চারদিকে উঁচু প্রাচীর, সেতু প্রভৃতি দিয়ে এগুলিকে সুরক্ষিত রাখা হত। পাথরের তৈরী তিন তলা এই প্রাসাদগুলি বিলাসে ও ঐশ্বর্যে ভরপুর থাকত। ম্যানরগুলির শাসন ও নানা রকমের অফিস সংক্রান্ত কাজও এখান থেকে

করা হত। প্রাসাদের নীচের তলা সাধারণত রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহার করা হত ও উপর তলা শোবার ঘর, হলঘর, অতিথি আপ্যায়ন প্রভৃতির জন্য রাখা হত। আজকালকার দিনের মত না হলেও সে যুগের উপযোগী আসবাবপত্র এই প্রাসাদগুলিতে কম ছিলনা। বিনা-পরিশ্রমে এরূপ আরামপ্রিয় জীবনে অভ্যস্ত জমিদাররা শিকার, আমোদ-প্রমোদ, দুর্গ ও চার্চ নির্মাণ প্রভৃতি কাজে সময় কাটাত। বড় বড় জমিদাররা ম্যানর হাউস ছাড়া দুর্গেও দিন কাটাত ও সেখানের জীবনযাত্রা একই ধরনের ছিল।

এযুগে জমিদারদের খাদ্য, বেশভূষা প্রভৃতিতে ধীরে ধীরে বেশ উন্নতি দেখা যায়। ধর্মযুদ্ধের সময় থেকে নানা রকমের মসলা, আচার, চাটনী প্রভৃতি আমদানীর ফলে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় পরিবর্তন দেখা দেয়। সাধারণভাবে আপেল, চেরী, পেয়ারা প্রভৃতি ফল, পেঁয়াজ, বাঁধাকপি, গাজর প্রভৃতি সব্জীর চলন ছিল বেশী। মাছ মাংসও খাওয়া হত প্রচুর। দুধের ব্যবহার বলতে পনীর ব্যবহারের কথাই শোনা যায়। চা কফির চলন অবশ্যই এযুগে শোনা যায় না। পানীয়র মধ্যে এল ও মদই ছিল প্রধান। ছুরি ও কাঁটার চলন তখন হয়নি, সেজন্য কাঠের চামচ ব্যবহার করা হত। দুর্গে ও ম্যানর হাউসগুলির জীবনযাত্রায় মহিলাদের অবসর ছিল. কম। কারণ প্রতিনিয়তই অতিথি আপ্যায়ন প্রভৃতি লেগেই থাকত।

এই ম্যানর হাউসগুলির কাছাকাছিই থাকত যাজকদের বাড়ী, গির্জা বা উপাসনার জায়গা। 'ম্যানর হাউস' গুলির মত এগুলিও প্রাসাদের মত দেখতে লাগত এবং এগুলি ছাড়াও গ্রামে আর অন্য কোন পাকা বাড়ীই ছিল না। পাথরের ব্যবহার সুরু হওয়ার আগে দুর্গের মত এগুলিও কাঠ দিয়েই তৈরী হত।

ম্যানরের জমিদাররা জমি সংক্রান্ত নানা রকমের বিবাদ, পাওনা-গণ্ডা প্রভৃতি মেটাবার জন্য এক ধরণের বিচার সভা রাখতেন। এগুলি জমিদারদের বাড়ীর হলঘরে বা গ্রামের গীর্জায় বা খোলা মাঠে বসত। বিচারের কাজে চাষীদের সাহায্যের দরকার হত। কারণ গ্রামের

রীতিনীতি, ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি ব্যাপারে সেই গ্রামের চাষীরা সাহায্য করতে পারত। অতি সামান্য অপরাধে চাষীদের কড়ারকমের জরিমানা দিতে হত, আর এসব টাকা জমিদারের তহবিলে জমা পড়ত। ফলে নানা রকমের আয়ের জরিমানার মধ্যে জমিদাররা এই বিচারের কাজ থেকেও ভাল আয় করত। এই বিচার ব্যবস্থার কাগজপত্র থেকে সেকালের নানারকম খবর জানা যায়। জমি সংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়াও চাষীদের মধ্যে নানা রকমের ঝগড়াঝাটি, জিনিষপত্র কেনাবেচায় গোলমাল, গালিগালাজ, মারধোর প্রভৃতি ব্যাপারেও এখানে বিচার হত।

প্রতি ম্যানরে জমিদারদের নিজেদের কর্মচারী ছাড়া জমিদারী দেখাশোনা ইত্যাদির কাজে বেইলিফ্, স্টিওয়ার্ড প্রভৃতি কর্মচারীদের নাম করা যেতে পারে। এছাড়া প্রতি গ্রামেই একজন সুপারভাইজার বা পরিদর্শক থাকতেন। পরিদর্শকের কাজ ছিল চাষীরা ঠিকমত কাজকর্ম করছে কিনা দেখা শোনা করা।

তৃতীয় পাঠ

ম্যানরগুলির অর্থনৈতিক দিক : চাষবাসের যৌথ ব্যবস্থা

ম্যানরের জমিগুলিতে আজকালকার মত কোন রকম বেড়া বা আল দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। জমিতে লাঙ্গল দেওয়া, বীজ বোনা, চারা পোতা ও ফসল তোলা প্রভৃতি চাষের সব কাজই সে যুগে একা করা সম্ভব ছিল না। এর কারণ ছিল অনেক। কোন চাষীর লাঙ্গল থাকলে হয়ত তার বলদ থাকত না, আবার কারও বলদ থাকলে লাঙ্গল থাকত না। এ ছাড়া সে যুগে আজকালকার মত চাষের জন্য নানা রকম যন্ত্রপাতিও ছিল না। দৈহিক পরিশ্রম ছাড়া চাষবাসের কাজ ভাবাই যেত না। শক্ত মাটিতে লাঙ্গল দেওয়ার সময় দেখা যেত এক ফালি জমিতেই দশ বারটা বলদ ছাড়া লাঙ্গল টানা যাচ্ছে না। ফসল তোলার সময়েও এরূপ অনেকের এক সাথে চেষ্টার দরকার হত। এ সময়েও গ্রামের সব চাষী, তাদের স্ত্রীলোক, ছেলেমেয়ে সকলে মিলে রাই, গম,

ওট প্রভৃতি ফসল তোলা, গোলায় নিয়ে যাওয়া, ফসল ঝাড়া, নিংড়ান প্রভৃতির কাজ করত। ফলে এ যুগে চাষবাসের কাজে যৌথ বা সমবায় প্রথা দেখা যায়।

গ্রামের এই খোলা ও বিস্তীর্ণ জমির মাঝে প্রায় প্রতি চাষীর জন্য ফালি ফালি জমি থাকত। একজনের এই ফালি জমির সাথে অপরের জমির মাঝখানে সামান্য সরু ফাঁকা লাইনের মত জায়গা রাখা থাকত। এই ফালি বা টুকরো জমিগুলিকে জার্মান ভাষায় বলা হত 'মরগেন্ ল্যাণ্ড'; অর্থাৎ এক সকালেই এর লাঙ্গল দেওয়া হয়ে যেত।

প্রতি পরিবারের মালিকের এরূপ ফালি জমির পরিমাণ কতটা হবে তা নির্ভর করত তিনি গ্রামের যৌথ চাষ ব্যবস্থায় ক'টি বলদ দিতে পারবেন তার উপর। গোড়ার দিকে জার্মান গ্রামগুলিতে সাধারণত 'হাইড' বা একশ কুড়ি একরের জমিকে এক একটি মাপ ধরা হত। মধ্যযুগে ইংল্যাণ্ডের গ্রাম গুলিতে দেখা যায় প্রতি চাষীর ত্রিশ একরের মত জমি থাকত। তবে বিভিন্ন জায়গায় এর পরিমাণ আরও কম হত। এই জমিগুলি আবার একই সাথে বা একই জায়গায় থাকত না। এর কারণ হল ভাল মন্দ সব রকমের জমিই চাষীদের দেওয়া হত।

প্রত্যেক ম্যানরে জমিদার আবার নিজের জন্যও কিছু জমি রেখে দিতেন। এগুলিকে বলা হত জমিদারের খাস জমি বা 'ডিমেইন্।' চাষীদের ফালি জমির পাশেই এগুলো থাকত। তবে গ্রামের সবচেয়ে ভাল জমিগুলিই জমিদার নিজের খাস জমি হিসাবে রাখতেন। এ জমিগুলির চাষের দায়িত্ব থাকত গ্রামের চাষীদেরই উপর। একে বলা হত বেগার প্রথা অর্থাৎ জমিদারের খাস জমিতে গ্রামের চাষীদের বিনা পয়সায় খাটতে হ'ত।

সামন্তযুগে এরূপ জমিদারের জন্য. চাষীদের বিনা পয়সায় খাটা নিয়মই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে ধীরে ধীরে এরূপ বেগার খাটারও একটা নিয়ম চালু হয়। এ নিয়মে প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক চাষীকে তার বলদ দুটি নিয়ে অন্তত তিন দিন কাজ করতে হত। এভাবে চাষের সব কাজই, যেমন লাঙ্গল দেওয়া, বীজ বোনা, চারা পোতা, ফসল তোলা জমিদার বিনা পয়সায় চাষীদের দিয়ে করিয়ে নিতেন।

চতুর্থ পাঠ

ম্যানরগুলির অর্থনৈতিক দিক ঃ স্বনির্ভরতা

যৌথ চাষবাসের ফলে প্রায় প্রতিটি ম্যানরেই উৎপন্ন শস্যে গ্রামবাসীদের প্রয়োজন মিটত। শস্য ছাড়াও গ্রামের লোকেদের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সব দরকারী জিনিষগুলিই গ্রামে উৎপন্ন হত। এ কারণে এ যুগের ম্যানরগুলি সম্পূর্ণভাবে না হলেও প্রায় স্বনির্ভর ছিল বলা চলে। বাজার প্রভৃতি সৃষ্টি হওয়া দেখে অনেকেই মনে করেন যে গ্রমের উৎপন্ন শস্য ও পণ্য বস্তু প্রয়োজনের তুলনায় বেশী হত। কারণ মধ্যযুগের প্রথম দিকে ম্যানর-গুলিতে মুনাফার প্রশ্ন ছিল না। শস্য ছাড়া গ্রামগুলিতে আরও যে সব জিনিষ উৎপন্ন ও পণ্য হিসাবে লেনদেন হত সেগুলি হল চামড়া শুকিয়ে জুতা, লাগাম ও উল থেকে নানারকমের পোষাক ইত্যাদি। প্রতি ম্যানরেই অন্তত একজন করে কামার, কুমোর, ছুঁতোর থাকত। মশলা, নূন, যাঁতার পাথর, লোহা প্রভৃতি বাইরের থেকে আনতে হয়।

গ্রামের চাষযোগ্য জমিগুলি যেমন শস্য উৎপাদন ও স্বনির্ভরতার জন্য দরকার ছিল, তেমনি অচাষযোগ্য জমিগুলিরও দরকার কম ছিল না। গ্রামের মানুষগুলির মত ঘরে পোষা ও চাষের জন্য দরকারী জীবজন্তুর খাদ্য শস্যও এ গ্রামগুলিই জোগান দিত। জ্বালানীর জন্য ও অন্য কাজের জন্য কাঠের দরকার ছিল। আবার গরু, হাঁস প্রভৃতির জন্য জলাশয় ও চারণভূমির দরকার ছিল। এ কারণেই প্রতি গ্রামে চারণভূমি ও জঙ্গল থাকত। এই চারণভূমি ও জঙ্গলগুলি ছিল গ্রামের যৌথ সম্পত্তি। চাষের মত এ ব্যাপারেও যৌথ ব্যবস্থা বহু আগে থেকেই চলে আসছিল। অনেকে মনে করেন যে গোড়ার দিকে জার্মান গ্রাম গুলিতে চাষবাস যোগ্য জমিও এরূপ গ্রামের যৌথ ব্যবস্থাতেই থাকত। গ্রামের পতিত জমি, চারণভূমি, বনজঙ্গল প্রভৃতির মালিকানা সময়ের সাথে জমিদার দখল করে নিয়ে ছিল ঠিকই, কিন্তু এগুলোতে জনসাধারণের ব্যবহার করার অধিকার কোন কালেই জমিদাররা নিয়ে

নেননি। চাষের জমিগুলিতেও শস্য ও খড় তুলে নেওয়ার পর সেগুলিও চারণভূমির মতই চাষীরা তাদের পোষা জীবজন্তুর জন্য ব্যবহার করতে পারত।

শস্য উৎপাদনের ব্যাপার ম্যানরের চাষযোগ্য জমিগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হত। শরৎকালে গম ও রাই বোনা হত, আর গ্রীষ্মকালে ফলন হলে তোলা হত। দ্বিতীয় ভাগের জমিগুলিতে শস্য বোনা হত বসন্তকালে, আর তোলা হত গরমের শেষ দিকে। এ সময়ে বার্লি, রাই, ওট, বীন, মটর প্রভৃতির চাষ হত। তৃতীয় ভাগের জমিতে সে বছর চাষই করা হত না। এগুলিকে পতিত জমি হিসাবে ফেলে রাখা হত। পরের বছর এতে চাষ করা হত। এর কারণ হল জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করা। এ ভাবে প্রতি বছরর তিন ভাগের এক ভাগ জমিকে পালাক্রমে পতিত করে রাখা হত। এটা করা হত অবশ্যই ভাল ফসল পাবার আশায়।

পঞ্চম পাঠ

ম্যানরের চাষীদের জীবনযাত্রা : সমাজ ব্যবস্থা

ম্যানরের চাষীদের মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়, স্বাধীন চাষী ও 'সার্ফ' বা ভূমিদাস। তবে কয়েক ক্ষেত্রে এই স্বাধীন চাষীদের থেকে সার্ফদের আলাদা করা ছিল মুস্কিল। কারণ এরা যদি জমিদারের কাছ থেকে সার্ফদের মতই জমিদারকে বেগার ও খাজনা প্রভৃতি দেওয়ার শর্তে জমি চাষ করতে নিত, তাহলে খুব তাড়াতাড়িই তারা সার্ফদের অবস্থায় পৌঁছে যেত। আবার অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র খাজনার বিনিময়ে জমি নিয়েও একই গ্রামে ও একই জমিদারের অধীনে থাকার ফলে তাদের অবস্থাও সার্ফদের মত হয়ে দাঁড়াত।

মধ্যযুগের সাহিত্যে চাষীদের বর্ণনা পড়লে দেখা যায় যে এযুগের লেখকরা এদের মানুষ বলেই মনে করতেন না। জমিদাররা এদের কাছ থেকে নানা ধরনের কর, বাধ্যতামূলক কাজ প্রভৃতি আদায় করতেন। ফলে বছরের সব সময়ে পরিশ্রম করেও এরা কোন রকমে

বেঁচে থাকত মাত্র। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও এদের খাবার জুটত অতি সামান্য, আর বাড়ী বা পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি ব্যাপার এরা জানত না বললেই হয়। এদের জীবনযাত্রার মান বলতে কিছু ছিল না। লতাপাতা আচ্ছাদিত, জানালাবিহীন বদ্ধ ঘরে, মাটির মেঝেতে চাষীরা কোন রকমে বেঁচে থাকত। ঘরের মধ্যে উনুনের ধোঁয়া বের হবার জন্য ছাদে সামান্য ফুটো থাকত, তাতে আবার বর্ষার জল আর শীতে বরফ পড়ত। সন্ধ্যার বাতি জ্বালাবার কোন প্রশ্নই ছিল না। ফলে দিন শেষ হওয়ার সাথে তারাও ঘুমিয়ে পড়ত। বিছানা বলতে সামান্য তক্তার উপর খড় বিছিয়ে তাদের ঠাণ্ডা থেকে শরীর বাঁচাতে হত। আসবাব বলতে মাটির হাঁড়িকুড়ি, আর সামান্য দু একটা কাঠের বাক্স বা টুল থাকত। গরমের দিনে চাষীদের স্ত্রীরা এই কুঁড়ে ঘরগুলির বাইরে উঠোনে রান্নাবান্না করত। এই কুটির-গুলির ভিতরেই আবার তাদের ঘোড়া, গরু, কুকুর, হাঁস, মুরগী আশ্রয় পেত।

চাষীদের ভাল খাবার বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। শীতকালের সময় মাংস নুন দিয়ে রাখা হত। মোটা আটার লাল রুটি ও সামান্য শাকসব্জি ও পচাই মদ প্রভৃতি ছিল তাদের দৈনন্দিন খাদ্য ও পানীয়। মাখন, দুধ, ভাল রুটি পেলে চাষীদের আনন্দের সীমা থাকত না। বিয়ার বা মদ উৎসব আয়োজনে পাওয়া যেত।

দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চাষীদের জীবন যাত্রা প্রায় এরূপই ছিল। জমি ছাড়া তাদের অন্য কোন জগৎ ছিল না। আর জমিদার ছাড়া তাদের বাঁচার কোন পথ ছিল না।

জমিদাররা বা যাজকরা এই চাষীদের থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখত। ফলে এই দুই শ্রেণী ম্যানরের সমাজ ব্যবস্থায় পৃথক গোষ্ঠী হিসাবেই বসবাস করত। যাজকরা খ্রীষ্টের বাণী প্রচারের মাধ্যমে সকল মানুষই সমান এরূপ বলতেন ঠিকই, কিন্তু সমাজের এই শ্রেণী বিভাগকে তারা বেশ কঠোর ভাবেই মেনে চলতেন। এর কারণ হল মধ্যযুগের ধ্যানধারণায় এরা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে

ঈশ্বর অভিপ্রেত বলেই ধরে নিয়েছিল। ফলে সাধারণ মানুষ জমিদার ও যাজক শ্রেণীর সেবার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে এরূপ এক ধারণা প্রায় সকলেই বিশ্বাস করত। সমাজ ব্যবস্থায় এই তিন স্তর তিনটি 'এস্টেট্' নামে পরিচিত ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় 'এস্টেট্' বলতে যাজক জমিদার এই দুই শ্রেণী বোঝাত; আর তৃতীয় 'এস্টেট্' বলতে সাধারণ মানুষ বা চাষীদের বোঝাত। এই তৃতীয় 'এস্টেটের' লোকেরাই শারীরিক পরিশ্রম করে চাষ বাস করত আর প্রথম দুই এস্টেট্ এদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করত। চাষীরা জমিদারদের নানা ধরনের কর, বিনা পয়সায় পরিশ্রম (বেগার) প্রভৃতি দিতে বাধ্য থাকত। এমন কি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের জন্যও এরা জমিদারের একচেটিয়া ব্যবসার, যেমন গম ভাঙ্গার যাঁতাকল প্রভৃতির উপর নির্ভর করত।

ষষ্ঠ পাঠ

সার্ফ বা ভূমিদাস প্রথা

সার্ফ বা ভূমিদাস প্রথা ছিল মধ্যযুগের এক কলঙ্ক। ক্রীতদাসদের সাথে এদের কোন তফাত ছিল না। বলতে গেলে এরা ছিল জমিদারদের অস্থাবর সম্পত্তি বিশেষ। এরা কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারত না ও বাজারের পণ্যের মত এদের বিক্রী পর্য্যন্ত করা চলত। এরা ইচ্ছামত নিজেদের গ্রামের জমি ছেড়ে অন্যত্র কাজের জন্য যেতে পারত না। অবশ্য তারা যদি নিজেদের গ্রামের জমি ঠিকমত চাষ করত তাহলে জমিদাররা তাদের জমি কেড়ে নিত না। বিয়ের ব্যাপারেও এদের জমিদারের মত নিতে হত এবং জমিদারকে অর্থ দিতে হত। একই ম্যানরে অবশ্য সার্ফদের বিয়ে করতে অসুবিধা ছিল না। কিন্তু এক ম্যানরের পাত্রের সাথে অন্য ম্যানরের পাত্রীর বিয়ে ঠিক হলে অসুবিধা হত। এক্ষেত্রে পাত্রী পক্ষের জমিদাররা বেশী আপত্তি তুলতেন; তবে বেশী পাওনা গণ্ডা পেলে শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য এরা মত দিতেন।

জমিদাররা সার্ফদের কাছ থেকে কর হিসাবে নানা রকমের পাওনা আদায় করত। এই সব পাওনা কখনও শস্য দিয়ে, কখনও বা শারীরিক পরিশ্রম দিয়ে আবার কখনও মুদ্রা দিয়ে শোধ করতে হত। এ ব্যাপারে অবশ্য সব জায়গায় একই ধরনের নিয়ম ছিলনা। প্রতি বছর প্রত্যেক সার্ফকে 'ক্যাপিটেসন্' বা মাথা পিছু কর নামে এক রকমের কর দিতে হত। এর পরিমাণ অবশ্য খুব বেশী ছিল না। কিন্তু এ কর ছিল দাসত্বের প্রতীক। 'টেইলী' নামে আর এক রকমের কর তাদের দিতে হত। ফ্রান্সে এ করের সঠিক পরিমাণ কিছু ছিল না। এসব ছাড়া জমিদারদের ছেলে মেয়ের বিয়ে, বড় দিন, ঈষ্টার প্রভৃতি সময়েও চাষীদের রেহাই ছিলনা। কোন সার্ফ মারা গেলে তার ছেলেকে সেই জমিচাষের অধিকার পেতে হলেও কর দিতে হত। একে বলা হত 'হেরিয়েট' বা উত্তরাধিকার কর। চারণ ভূমি, বনজঙ্গল, পতিত জমি প্রভৃতি ব্যবহার করার জন্যও জমিদাররা চাষীদের কাছ থেকে কর নিত।

জমিদারের এরূপ নানা ধরনের পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে সার্ফদের আবার চার্চকে অর্থাৎ যাজকদের 'টাইথ' নামে কর দিতে হত। সার্ফদের মারা যাওয়ার পর তাদের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে জমিদারদের মত যাজকরাও 'মরটুয়ারী' নামে কিছু পাওনা আদায় করতেন।

জমিদাররা অবশ্য কর বা নানা রকমের পাওনা আদায় করেই চাষীদের যে রেহাই দিতেন তা নয়। চাষীদের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য ব্যাপারেও জমিদাররা পয়সা আদায় করার জন্য রুটি তৈরীর উনুন, গম ভাঙ্গার যাঁতাকল, অঙ্গুর মাড়াই করার কল প্রভৃতির একচেটিয়া ব্যবসা করত। চাষীদের কাছ থেকে এরূপ নানাভাবে অর্থ আদায় ছাড়া প্রতি চাষীকেই সপ্তাহে তিন দিন জমিদারের খাস জমিতে বেগার দিতে হত। জমিদাররা তাদের খাস জমিগুলিতে রোয়া, বোনা, ফসল তোলা প্রভৃতি চাষের যাবতীয় কাজ ওদের বিনা পয়সায় করিয়ে নিত। এ ছাড়াও রাস্তাঘাট, সেতু প্রভৃতি তৈরীর কাজও চাষীদের বিনা পারিশ্রমিকে করতে

হত। এ সকল রাস্তা ও সাঁকো ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে জমিদাররা পয়সা আদায় করত, আর যে সব ম্যানরে হাট বাজার বসত সেখান থেকেও জমিদারদের পাওনা হত।

সার্ফ প্রথা যেমন মধ্যযুগের কলঙ্ক; তেমনি মধ্যযুগেই আবার সার্ফদের মুক্তিও সুরু হয়। এজন্য মধ্যযুগের ইতিহাসে সার্ফদের মুক্তির ঘটনাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই মুক্তি যে হঠাৎ এসেছিল তা নয়; আবার জমিদার বা যাজকরা দয়াপরবশ হয়ে একসাথে এদের মুক্ত করে দেয়নি। সুতরাং সার্ফ প্রথা উঠে যাওয়ার জন্য সাধারণভাবে সার্ফদের নিজেদের চেষ্টা ও সে যুগের কয়েকটি ঘটনাকেই দায়ী করা যায়।

প্রথমত রাস্তাঘাটের উন্নতির ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে ও চাষীদের উৎপন্ন শস্য ও পণ্য সামগ্রী শহরের বাজারগুলিতে বিক্রী করার সুবিধা হয়। এর ফলে চাষীদের আর্থিক অবস্থা ভাল হয় ও তারা জমিদারকে প্রচুর অর্থ দিয়ে মুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। লোকসংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকলে জঙ্গল, জলা জায়গা প্রভৃতিতে বসতি গড়ে উঠে এবং সার্ফদের কাছে এ সব অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বসবাস করার ইচ্ছা গড়ে উঠে। জমিদাররাও ক্রমশ অবস্থার সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে সুরু করে এবং সার্ফ প্রথায় বেগার প্রভৃতির বদলে প্রজাদের কাছ থেকে একটা নির্দিষ্ট টাকায় তারা জমি বিলি করতে সুরু করেন। সার্ফদের কাজের চেয়ে দিন মজুরীতে কাজ করার সুবিধাও তাদের চোখে পড়ে। আইনসম্মত ভাবে তো বটেই আবার বেআইনীভাবেও সার্ফদের মুক্তির পথ ভালভাবেই খোলা ছিল। প্রথমত, একজন সার্ফ নিজের ম্যানর থেকে পালিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারত। শহরাঞ্চলে এসব পলাতক সার্ফ সহজেই কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা কারখানায় কাজ পেয়ে যেত। আবার অন্য কোন নূতন গড়ে উঠা বসতিতে অথবা অন্য ম্যানরে দয়ালু জমিদারের কাছে পালিয়ে গিয়ে তারা নূতন ভাবে জীবন সুরু করত।

এছাড়া সার্ফদের মুক্ত হওয়ার সোজা পথ ছিল জমিদারের বিরুদ্ধে দলবদ্ধভাবে বিদ্রোহ করা। সার্ফদের মনে অসন্তোষ সব সময়েই

থাকত আর তারা প্রায়ই জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করত। তবে জমিদাররা আগের দিকে এসব বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করতেন। শহরের অনুকরণে বিদ্রোহ করে জমিদারের কাছ থেকে এদের নানা সুবিধা আদায় করার ঘটনাও বিরল নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সারা গ্রামের সার্ফরা বিদ্রোহ করে নিজেদের মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। আবার কোথাও এক গ্রামের সর্ফরা দলবদ্ধভাবে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র মুক্ত জীবনের জন্য বেরিয়ে পড়েছিল।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions)

এক কথায় উত্তর দাও :—

১। সামন্ততন্ত্র কাকে বলে ?

২। সাধারণত সামন্ততন্ত্রের সময়কাল ক'শ বছর বলে ধরা হয় ?

৩। দুর্গ সৃষ্টির কারণ কি ?

৪। ইংরেজী 'ক্যাভলরি'র বাংলা কি ?

৫। 'ডিমেইন' বলতে কি বোঝায় ?

৬। 'সাফ' বলা হত কাদের ?

সঠিক উত্তরটির উপর √ চিহ্ন দাও :—

১। সামন্ত প্রথায় রাজার ক্ষমতা/ঠিক ছিল/কমে গিয়েছিল/কিছুই ছিলনা।

২। দুর্গের সৃষ্টি/যুদ্ধের জন্য/আত্মরক্ষার জন্য/যুদ্ধ ও আত্মরক্ষার জন্য।

৩। নাইট হুডপ্রথার প্রথম উদ্ভব/জার্মানী/ইটালী/ইংল্যাণ্ড।

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন (Short Essay Type)

১। সামন্ত প্রথা চালু হওয়ার কারণ কি ছিল ?

২। সামন্ত প্রথার বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ?

৩। কোন্ অঞ্চল দুর্গ নির্মাণের উপযুক্ত মনে করা হত ?

৪। 'শিভ্‌লরি'কে সামন্ত প্রথার পরিণতি বলা যায় কেন ?

৫। 'ট্রব্যাডুয়্যা' বলতে কি বোঝ ?

৬। 'ম্যানর' প্রথাকে সামন্তপ্রথারই অংশ বলা হয় কেন ?

সংক্ষিপ্ত রচনা ভিত্তিক প্রশ্ন (Short Essay Type)

১। মধ্যযুগে ইউরোপে সামন্ত প্রথার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। 'সাফ' প্রথা কি ? কিভাবে এর অবসান হয় ?

অষ্টম অধ্যায়

ক্রুসেড্ (ধর্মযুদ্ধ)

প্রথম পাঠ

ধর্মযুদ্ধগুলির উদ্দেশ্য

মধ্যযুগে ক্রুসেড্ বা ধর্মযুদ্ধ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ক্রুসেড্ কথার অর্থ ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ। যীশুখ্রীষ্টের জন্মভূমি ও খ্রীষ্টানদের অতি পবিত্র স্থান জেরুসালেম্‌কে মুসলমানদের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য প্রায় দু'শ বছরের মধ্যে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়। ইতিহাসে এই যুদ্ধগুলিই ক্রুসেড্ বা ধর্মযুদ্ধ নামে পরিচিত।

আরবদেশের অধীনে থাকার সময় জেরুসালেমে খ্রীষ্টানদের তীর্থ করতে যাওয়ার জন্য কোন অসুবিধা হত না। কিন্তু ১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীরা এই স্থান দখল করার পর থেকে তীর্থযাত্রীদের খুব অসুবিধা দেখা দিল। শুধু তাই নয়, তুর্কীদের হাতে জেরুসালেমের পেট্রিয়ার্ক বা প্রধান বিশপের লাঞ্ছনা, গির্জাগুলির ধ্বংস সাধন প্রভৃতি ঘটনা খ্রীষ্টানদের মনে এক আলোড়ন সৃষ্টি করল। এরই প্রতিকারের জন্য খ্রীষ্টানরা শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। আজকালকার মত এইযুগে ঝগড়া মেটানর কোন বিশ্বসংস্থা ছিল না। সুতরাং যুদ্ধের মধ্য দিয়েই এইসব কলহের নিষ্পত্তি হত।

ধর্ম ছাড়াও এই যুদ্ধগুলির পিছনে অন্য কারণও ছিল। ইটালীর নগরগুলি এশিয়ার এই অঞ্চলের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করতে আগ্রহী ছিল। ইউরোপের বহু 'নাইট' ও রাজপরিবার মুসলমানদের যুদ্ধে হারিয়ে তাদের জায়গা জমি দখল করে আরও সম্পত্তির অধিকারী হতে চেয়েছিলেন। ফ্রান্সে সামন্ত প্রথা সৃষ্টির সাথে এক অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এদেরও এরূপ আশা-আকাঙ্ক্ষা এই ধর্মযুদ্ধগুলিতে ইন্ধন জুগিয়ে ছিল।

এ যুগে পোপই ছিলেন খ্রীষ্টান জগতের সর্বোচ্চ ধর্মনেতা। ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় আরবান্ ক্লেয়ার্ মণ্টের সভায় তুর্কীদের কাছ থেকে জেরুসালেম উদ্ধারের জন্য এক উন্মাদনার সৃষ্টি করলেন। ধর্মের দিক ছাড়াও এই সভায় তিনি খ্রীষ্টানদের বৈষয়িক লাভের কথাও বলতে ভুললেন না। ব্যক্তিগতভাবে পোপ এরূপ যুদ্ধের ফলে ইউরোপে সামন্তদের কলহ বন্ধ করার পথও দেখতে পেয়েছিলেন। এ কারণে প্রথমেই তিনি 'নাইট'দের ধর্মযুদ্ধে অংশ নিতে বলেন। প্রথম ধর্মযুদ্ধে কোন রাজা অংশ নেননি। লোরেন, নরম্যাণ্ডি, তুঁলোঁ প্রভৃতি স্থানের 'নোব্‌লরা' প্রথম ধর্মযুদ্ধের ভার নেন। ১০৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জেরুসালেম খ্রীষ্টানদের দখলে আসে। আক্রমণ ঠেকানর জন্য জেরুসালেমকে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থাও হয়। এর অল্পকালের মধ্যেই জেরুসালেমের পাশপাশি ট্রিপলি, এডেসা, এন্টিওক্ প্রভৃতি স্থান খ্রীষ্টানদের দখলে আসে। কিন্তু শীঘ্রই 'নাইট' ও 'ব্যরণ'দের ঝগড়াঝাটির ফলে খ্রীষ্টানদের শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে।

খ্রীষ্টানদের মধ্যে এরূপ ঝগড়াঝাটির ফলে মুসলমানরা ফের খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার একতা ফিরে পায়। ১১৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জাঙ্গী নামে এক সামরিক নেতা এডেসা ধ্বংস করে। ফলে জেরুসালেমের সুরক্ষা বিপন্ন হয়ে উঠে এবং দ্বিতীয় ক্রুসেডের প্রয়োজন হয়। এই সময়ে জার্মানীর রাজা তৃতীয় কনার্ড ও ফ্রান্সের রাজা সপ্তম লুই অংশ নিয়েছিলেন ; তবে তারা উভয়েই ফিরে আসতে বাধ্য হন। ফলে দ্বিতীয় ক্রুসেড্ ব্যর্থ হয়।

১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানরা জেরুসালেম দখল করে নেয়। ফলে পুনরায় যুদ্ধের প্রয়োজন দেখা দেয় (তৃতীয় ক্রুসেড)। এই ঘটনার বেশ কিছু আগে থেকেই খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের একতার ভাব সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে মিশরের সালাদিনের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে খ্রীষ্টানরা জেরুসালেমের সিংহাসন নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে। ফলে তারা অতি সহজেই পরাজিত হয়। জার্মানীর ফ্রেডারিক বার্বারোসা, ইংল্যাণ্ডের প্রথম রিচার্ড,

ফ্রান্সের ফিলিপ অগাষ্টাস প্রভৃতি রাজারা জেরুসালেম উদ্ধার করতে ব্যর্থ হলেন।

খৃষ্টানদের এই পরিণামে পোপ তৃতীয় ইনোসেণ্ট খুবই ব্যথিত হলেন। তাঁর নেতৃত্বে সারা ইউরোপে ফের ধর্মযুদ্ধের জন্য প্রচার স্থুরু হল। শেষ পর্য্যন্ত ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ ক্রুসেডের সূচনা হল। অবশ্য এবারের এই যুদ্ধকে ঠিক ধর্মযুদ্ধ বলা যায় না। কারণ যে উদ্দেশ্যে জেরুসালেম উদ্ধার করার দরকার ছিল তা হয়নি। ফ্রান্সের 'নাইট' ও 'নোবলরা' এবং জার্মানী, ইটালী ও সিসিলির সৈন্যরা এই যুদ্ধে সাড়া দিলেও তারা এই যুদ্ধে নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির দিকেই নজর দিয়েছিল। এবারের যুদ্ধে সৈন্যরা স্থলপথের বদলে জলপথে যুদ্ধ যাত্রা করে ভেনিসের সাহায্য পায়। ইতিমধ্যে বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে গৃহবিবাদ স্থুরু হয় এবং ধর্মযোদ্ধারা ভাড়াটিয়ে সৈন্যর মতই সিংহাসনের এক দাবীদারের হয়ে যুদ্ধ করে। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে তারা কনস্টাণ্টিনোপল দখল করে নেয়। ঐ বছরের শেষে কনস্টাণ্টিনোপলে এক বিদ্রোহ স্থুরু হয় এবং ধর্মযোদ্ধারাও আবার অর্থের বিনিময়ে এক দাবীদারের হয়ে যুদ্ধ স্থুরু করে। কিন্তু এবারের এই যোদ্ধারা যেরকম ধ্বংস, লুঠতরাজ ও অত্যাচার চালায় সেরকম ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে খুবই কম দেখা যায়। এর পর ভাগাভাগির ফলে বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য বলতে বিশেষ কিছুই রইল না। ১২৬১ খ্রীষ্টাব্দে অবশ্য এই সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় এবং এই সময় থেকে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টাণ্টিনোপল তুর্কীদের অধীনে না আসা পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। ধর্মযুদ্ধের এই পরিণতি দেখলে বোঝা যায় যে ধর্মের চেয়ে বৈষয়িক দিকই যোদ্ধাদের বেশী প্রভাবিত করেছিল।

দ্বিতীয় পাঠ

ধর্মযুদ্ধের প্রভাব

ধর্মযুদ্ধগুলির প্রভাবে সে যুগে ইউরোপের সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। শহর ও গ্রামের সাধারণ মানুষ মুক্তির এক পথ খুঁজে পায়। সার্ফ'রা (ভূমিদাস) এই যুদ্ধে যোগ

দেওয়ার সুযোগ পাওয়ার ফলে তারা তাদের চিরাচরিত বন্ধন দশা থেকে মুক্তি পায়। শহরাঞ্চলেও শিল্পের অগ্রগতির ফলে জমিদারদের অধীনে মজুররা মুক্তির পথ পায়। এছাড়া এযুগের আর এক বৈশিষ্ট্য হল মেয়েদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি। এর কারণ হল ধর্মযুদ্ধে অনেক ভূস্বামী যোগ দেওয়ার ফলে তাদের জমিজমা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাদের স্ত্রীদের উপর এসে পড়ে। ফলে তারা এসব কাজ চালাবার সুযোগ পান। ধর্মযুদ্ধকালে গ্রীক, মুসলমান প্রভৃতিদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে পশ্চিমের জীবনযাত্রার কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়।

বিভিন্ন জাতির ও ধর্মাবলম্বীদের এই যোগাযোগের ফলে অনেক চিরাচরিত প্রথা ও কুসংস্কারের অবসান হয়। ফলে সমাজে বুদ্ধিজীবিদের এক বিশেষ গোষ্ঠী ও মতবাদের সুরু হয়। ধর্মযুদ্ধের আগে মুসলমানদের প্রতি খ্রীষ্টানদের এক ঘৃণার ভাব ছিল, এই যুদ্ধের শেষদিক থেকে তারও পরিবর্তন দেখা দেয়। বহির্জগতের সঙ্গে মেলা মেশার ফলে খ্রীষ্টানদের কুপমণ্ডুকতা ও অসহনীয় মনোভাবের পরিবর্তন হয়। আরবদের জ্ঞানবিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চা খ্রীষ্টানদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং ইউরোপে রেনেসাঁস (নব জাগরণ) কে এরই ফলশ্রুতি বলা চলে। অনেকেই আবার পশ্চিমের সাহিত্যের উপর ক্রুসেডের প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখ করেন এবং ষোড়শ শতাব্দীতে শেক্সপীয়র ও মার্লোর ওপর নাবিকদের প্রভাবের কথা বলেন।

সাহিত্য, সমাজ, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি ছাড়াও পশ্চিমের অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর ধর্মযুদ্ধগুলির প্রভাব অপরিসীম। পূর্ব দেশের সহিত যোগাযোগের ফলে নূতন নূতন শহরাঞ্চল ও বাণিজ্যকেন্দ্রের পত্তন ঘটে। ইটালীর ভেসিন, পিসা, জেনোয়া প্রভৃতি শহর ও বন্দরগুলির আর্থিক সমৃদ্ধি এই ধর্মযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল বললে ভুল হবে না। ধর্মযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী বহু 'নোবলরা' (অভিজাত) নগদ অর্থের জন্য শহরাঞ্চলগুলির ওপর নির্ভর করতেন। বিনিময়ে তারা শহরগুলিকে অনেক রকম সুযোগসুবিধা দিতে বাধ্য হতেন। এইভাবে শহরগুলির স্বায়ত্ব শাসন সৃষ্টি হয়।

ইউরোপে বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রাচ্যের কার্পাস ও সিল্ক আমদানীর প্রয়োজন হত এবং এগুলির নানারকমের রংয়ের জন্য নীল ও ফিটকারী আমদানী করতে হত। কিন্তু বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানীর মত রপ্তানীর প্রায় সমান প্রয়োজন। এ কারণে ইউরোপের দেশগুলিতে শিল্পের প্রসার দেখা দেয়। এ যুগের শিল্প বলতে অবশ্য কুটিরশিল্পকেই বোঝায় এবং প্রধানত বস্ত্র ও মদ তৈরীর ব্যবসাকে কেন্দ্র করেই এই শিল্প গড়ে ওঠে। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই ইউরোপের বস্ত্রশিল্পে এক বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। উত্তর ফ্রান্সে ফ্লাণ্ডার্স ও উত্তর ইটালী প্রভৃতি অঞ্চল এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য পশম বস্ত্র শিল্পেই ঐ যুগে এ জায়গাগুলি নাম করেছিল। রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবশ্য এ জিনিষগুলিই শেষ কথা ছিল না। মিউজ্ অঞ্চলের তামার পাত্র, নূরেমবার্গের কাঠের পাত্র, পয়টোরের অস্ত্র ও বর্ম প্রভৃতি শিল্প এ ব্যাপারে উল্লেখ করা যেতে পারে।

দেশের কৃষি ও চাষবাসের সাথে এই কুটির শিল্পগুলির ক্ষেত্রে বিশেষ এক পার্থক্য দেখা যায়। দেশের খাদ্যের চাহিদা মেটানর জন্যই কৃষি অর্থাৎ চাষবাসের প্রয়োজন। অপরদিকে কুটির শিল্পগুলি দেশের চাহিদা ছাড়াও বহির্বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজন ছিল।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions)

এক কথায় উত্তর দাও :—

১। 'ক্রুসেড্' কথাটির অর্থ কি ?
২। কত খৃষ্টাব্দে জেরুসালেম তুর্কীদের হস্তগত হয় ?
৩। কোন্ সভায় পোপ প্রথম 'ক্রুসেডে্র' উন্মাদনা সৃষ্টি করেন ?
৪। কত খৃষ্টাব্দে জাঙ্গী এডেসা ধ্বংস করে ?
৫। কত খৃষ্টাব্দে চতুর্থ ক্রুসেডের সূচনা হয় ?

সঠিক উত্তরটির উপর √ চিহ্ন দাও :—

১। তুর্কীদের জেরুসালেম অধিকার ১০৫৬/১০৬৮/১০৭৬ খ্রীঃ
২। খৃষ্টানদের জেরুসালেম দখল ১০৮০/১০৮৫/১০৯৭ খ্রীঃ

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer Type)

১। ধর্মযুদ্ধের প্রাথমিক উদ্দেশ্য কি ছিল ?

২। মিশরের সালাদিন এ সময়ে কি ভূমিকা নিয়েছিলেন ?

৩। ধর্মযুদ্ধে ভেনিসের স্বার্থ কি ছিল ?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন (Short Essay Type)

১। ধর্মযুদ্ধগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। ইউরোপের সমাজ ও সংস্কৃতি ধর্মযুদ্ধগুলির প্রভাব নিরুপণ কর।

নবম অধ্যায়

প্রথম পাঠ

শহরের উৎপত্তি

খ্রীষ্টীয় একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপের সমাজ ও অর্থনীতিতে বিরাট এক পরিবর্তন দেখা দেয়। ফলে পুরনো রোমান আমলের শহরগুলির পুনর্জন্ম হয় এবং নূতন নূতন শহরের সৃষ্টি হয়। তবে মধ্যযুগে ঠিক কোন সময় থেকে শহরের উৎপত্তি হয় তা বলা মুস্কিল। এরূপ মনে করা হয় যে প্রতিটি শহরের উৎপত্তির পিছনে এর নিজস্ব কারণ বা ইতিহাস আছে। শহর সৃষ্টির ইতিহাস খুঁজতে গেলে দেখা যায় যে এযুগে কোন কোন ক্ষেত্রে দেওয়াল ঘেরা বিশপের এলাকা, মঠ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে শহর গড়ে উঠেছিল। আবার কোন ক্ষেত্রে অভিজাতদের দুর্গগুলিকে কেন্দ্র করেও শহরের সৃষ্টি হয়েছিল। শহর সৃষ্টির ইতিহাসে জনৈক লেখক অবশ্য এই দুর্গগুলিকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। দেওয়াল ঘেরা এসকল বসতি গুলিকে বলা হত বার্গ ; আর এখানকার অধিবাসীদের বলা হত 'বার্গার' বা 'বার্জেন্‌সেস্'। প্রয়োজনের তাগিদেই এই বার্গারদারের মধ্যে কুটিরশিল্প, যেমন চামড়ার কাজ, মাটির কাজ, কাপড় বোনা প্রভৃতি ছোট ছোট শিল্প গড়ে উঠতে লাগল। চাষের কাজ ছাড়াও অবসর সময়ে সার্ফ বা ভূমিদাসরা এই কুটির শিল্পের সাথে যুক্ত হয়। দেওয়াল ঘেরা এই

বসতিগুলিকে যদিও আজকালকার মান অনুযায়ী কোন রকমেই শহর বলা যায় না তবুও এগুলিই যে শহরের গোড়াপত্তন করেছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কুটির শিল্পের উন্নতির সাথেই বাজার অর্থাৎ এগুলি বিক্রীর এক ব্যবস্থা গড়ে উঠে ও ব্যবসায়ীদের আনাগোনা সুরু হয়। এই ভাবে ব্যবসায়ী, কারিগর প্রভৃতিদের সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়তে সুরু করায় তাদের বসতির জন্য দেওয়ালের বাহিরে সামন্তরা নূতন ভাবে
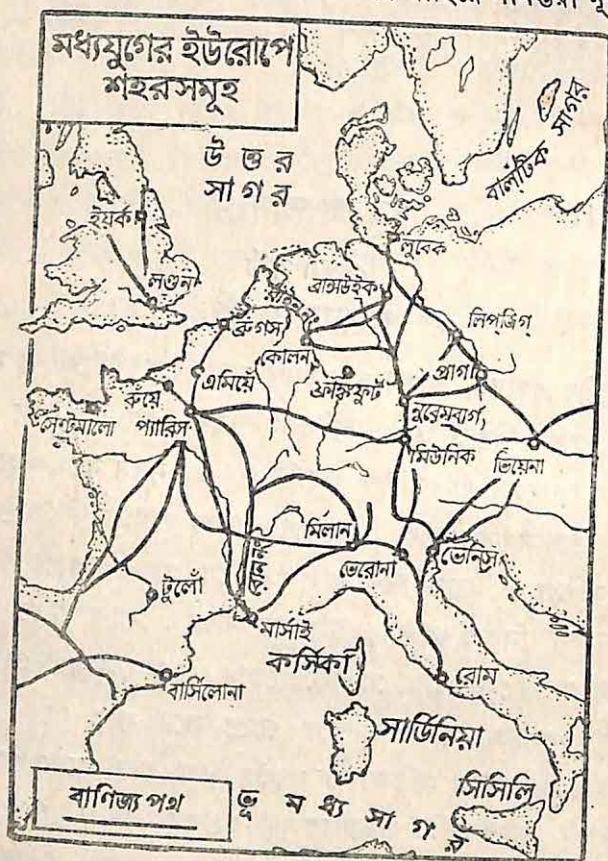
জায়গা দান করতে লাগলেন। দেওয়ালের চারদিকে এই বসতিগুলি ফেবার্গ নামে পরিচয় লাভ করে। একাদশ শতাব্দীতে নানা কারণে বিশেষত ক্রুসেড, বা ধর্মযুদ্ধের ফলে ব্যবসাবাণিজ্য উন্নতির সাথে শহরের সংখ্যাও বাড়তে সুরু করল। জলপথে পূর্বদেশের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ব্যবসাবাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হল এবং সমুদ্রের ধারে

বহু শহর বন্দর সৃষ্টি হল ও তাদের আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটতে লাগল। এর ফলে আবার বণিকদের ক্ষমতাও বাড়তে লাগল।

বাণিজ্যের বিরাট কেন্দ্র হিসাবে ভেনিস, পিসা, জেনোয়া, মার্সাই, গেণ্ট, ভিয়েনা, লণ্ডন, ব্রিষ্টল, ডাবলিন প্রসিদ্ধি লাভ করে। আগে ব্যবসায়ীরা সাধারণতঃ ঘুরে ঘুরে ব্যবসা করত। কিন্তু শহরে তারা স্থায়ী বসবাস করার পর থেকেই সমাজ জীবনে এক পরিবর্তন দেখা দিল এবং কালক্রমে সমাজে এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হল। এরাই 'বুর্জোয়া' বা তৃতীয় এস্টেট নামে পরিচয় লাভ করে। এছাড়াও অল্প-কালের মধ্যেই কিন্তু সামন্ত প্রথার অধীনে শহরাঞ্চলে পার্থক্য দেখা দিল। স্থায়ী বসবাসের আগে ব্যবসায়ীরা সার্ফ বা সামন্তদের প্রজাদের মত কোনরূপ বন্ধন দশায় জীবন কাটাতেন না। তারা নিজেদের সব ব্যাপার নিজেরাই ঠিক করতেন। একারণে স্থায়ী বসবাসের সময় থেকেই তারা নিজেদের সার্থে শহরের অন্য অধিবাসীদেরও অর্থাৎ বার্গারদের মধ্যেও এরূপ স্বাধীনতা আনতে চাইল। এ ব্যাপারে তাদের যুক্তি হল যে তারা কৃষিজীবিদের মত সামন্তদের প্রজা বা ভূমিদাস নন; সুতরাং তারা সামন্ত প্রথার বাধা নিষেধ মানতে বাধ্য নন। শহরের শাসন ব্যবস্থা তারা নিজেদের হাতে রাখতে চাইল। সামন্তরা যেমন রাজার ক্ষমতা অধিকার করে নিয়েছিল এই বার্গাররাও তেমনি সামন্তদের কাছ থেকে শহর-শাসনের ক্ষমতা ধীরে ধীরে নিয়ে নিয়েছিল। তাদের এই ক্ষমতার স্বীকৃতি তারা রাজার কাজ থেকে চার্টার বা লিখিত দলিলের মাধ্যমেই আদায় করেছিল। শহরে অধিবাসীরা পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করে শহর শাসন করতেন। এতে মেয়র, অল্ডারম্যান, কমিশনার্স ও অন্য কর্মচারী নিযুক্ত হতেন। পৌরসভার কাজ বলতে শহরের স্বাস্থ্য, বাজার-ঘাট, যানবাহন, ট্যাক্স আদায়, গৃহনির্মাণ, শিক্ষার ব্যবস্থা বুঝায়।

শহর জীবনের প্রধান লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল সামন্তপ্রথা জনিত সব রকমের বন্ধন থেকে মুক্তি। একারণে শহরবাসীরা তাদের কাজকর্ম, চলাফেরা, বিয়ে, সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রভৃতি সকল বিষয়ের স্বাধীনতাকে জীবনধারণের মূল অঙ্গ বলে মনে করত। এসব ব্যাপারে

তারা সামন্ত বা অভিজাতদের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করত না। সার্ফ বা ভূমিদাসরা শহরে এক স্বাধীন জীবনের আস্বাদন পায়। এখানে এক-নাগাড়ে তিনমাস বসবাস করতে পারলেই তারা মুক্তনাগরিক হিসাবে গণ্য হত। বলতে গেলে শহর সৃষ্টির পর থেকে সামন্ত প্রথার দিন শেষ হতে সুরু হয়। আগের মত জমির মালিকানাই সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি বা মান সম্মানের মাপকাঠি রইল না। জমির পরিবর্তে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমেই মানুষ নিজের ভাগ্য ফেরাবার চেষ্টা সুরু করল।

শহরের সমাজে এ সময় থেকে দুটি নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি হল। একটি 'বুর্জোয়া'—বণিক, ব্যাঙ্কার, শিল্পগোষ্ঠী প্রভৃতি আর অপরটি শ্রমিক শ্রেণী। সমাজের এই নূতন বিন্যাসের ফলে পরবর্তীকালে ইউরোপের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে বিরাট পরিবর্তন আসে। এ সময় থেকেই জাতীয় সার্বভৌম রাজতন্ত্রের সূচনা হয়। রাজারা এই 'বুর্জোয়া' বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল হন এবং দেশের পার্লামেণ্ট প্রভৃতিতে বার্গারদের প্রাধান্য সুরু হয়। ফলে সামন্ত প্রথার দিন শেষ হয়ে আসে।

মধ্যযুগে শহর জীবনের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যর মধ্যে গিল্ড্ প্রথার উল্লেখ করা যেতে পারে। শহরের শাসন প্রভৃতি নানা সমস্যার মত ব্যবসা প্রভৃতির নিয়ন্ত্রনেরও প্রয়োজন দেখা দেয়। শহরের শাসন ব্যবস্থার সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রন সমস্যার অবশ্য কিছু তফাৎ ছিল। ব্যবসায়ীদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের অঞ্চলে জিনিষ পত্র বিক্রী প্রভৃতিতে একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখা। একারণে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের লোকেরা যেমন বণিক, উৎপাদনকারী বা শিল্পী, বিক্রেতা প্রভৃতি নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এক এক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হত। এগুলি গিল্ড্ নামে পরিচিত ছিল। আজকালকার দিনের চেম্বার্স অফ কমার্স বা বণিক সমিতি, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতির সাথে এদের মিল আছে। 'গিল্ড্' গুলির উদ্দেশ্যই ছিল নিজেদের অঞ্চলে তাদের দ্রব্য সামগ্রীর বিক্রয় প্রভৃতির একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখা।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions)

এক কথায় উত্তর দাও :—

১। মধ্যযুগে দেওয়াল ঘেরা বসতিগুলির অধিবাসীদের কি বলা হত ?

২। দেওয়ালের বাহিরের বসতিগুলির নাম কি ছিল ?

৩। শহরের সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণী কি নামে পরিচয় লাভ করে ?

৪। 'সাফ´'রা কোথায় মুক্তির সুযোগ পায় ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer Type Questions)

১। মধ্যযুগে ইউরোপের শহর সৃষ্টির পিছনে দুর্গগুলির অবদান কি ছিল ?

২। কুটির শিল্পের উন্নতির সাথে বাজার সৃষ্টির সম্পর্ক কি ?

৩। শহর সৃষ্টির সাথে ধর্মযুদ্ধগুলির কোন সম্পর্ক কি ছিল ?

৪। 'বার্গার' ও সার্ফ´দের মধ্যে তফাত কি ?

৫। 'গিল্ড', প্রথা বলতে কি বোঝায় ?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন (Short Essay Type)

১। মধ্যযুগে শহর সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। শহরের উৎপত্তির সাথে সামন্তপ্রথার সম্পর্ক বর্ণনা কর।

দশম অধ্যায়

মধ্যযুগে দূরপ্রাচ্য

(১) মধ্যযুগে চীন (সপ্তম শতাব্দীর গোড়া থেকে চতুর্দশ শতাব্দী)

তাঙ্ বংশ (৬১৮-৯০৭ খ্রীঃ)

প্রথম পাঠ

চীনের একীকরণ : সংস্কারসমূহ

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে সমগ্র চীন জুড়ে একই সম্রাটের অধীনে শাসন ব্যবস্থার যে ধারণা দেখা দেয় তা সুই রাজবংশের আমলে (৫৮৯-৬১৮ খ্রীঃ) কিছুটা সফল হয়। পরে তাঙ্ বংশের রাজত্বের সময় (৬১৮-৯০৭ খ্রীঃ) এ প্রচেষ্টা চরম পরিণতি লাভ করে। এ বংশের প্রায় তিনশ বছর রাজত্ব কালে চীনের যে বিশাল সাম্রাজ্য

সৃষ্টি হয় তার আয়তন বা জনসংখ্যা সে কালের পৃথিবীতে ছিল বৃহত্তম। এ বংশের সম্রাট তাই সুং (৬২৭-৬৪৯ খ্রীঃ)-এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের সাম্রাজ্য সীমার যা বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে মহাপ্রাচীরের উত্তর প্রান্তের ঘাঁটি থেকে দক্ষিণে ইন্দোচীন ও পশ্চিমে তিব্বতের সীমানা থেকে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে এর বিস্তৃতি ছিল। সম্ভবত মঙ্গোলিয়া ও মধ্য এশিয়ার রাজ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেই এটা বলা হয়েছে। সাম্রাজ্যের সীমা যথেষ্ট বাড়লেও জনসংখ্যা কিন্তু পাঁচ কোটি থেকে কমে আড়াই কোটিতে দাঁড়িয়েছিল।

এযুগে চীনে সামন্ততন্ত্র ছিল না বটে, তবে সমাজ ও শাসন ব্যবস্থায় অভিজাতদের প্রভাবই ছিল সবচেয়ে বেশী। অভিজাতদের উপাধি ছিল ন' রকমের। এর মধ্যে কয়েকটি উচ্চ শ্রেণীর উপাধি রাজবংশের লোকেদের জন্য সংরক্ষিত থাকত। তাই সুং সাম্রাজ্যকে তাও (প্রদেশ), চৌ (জেলা) ও সিয়েন (মহকুমা) এরূপ বড় ও ছোট নানা বিভাগে ভাগ করেন ও এগুলিতে তিনি রাজকর্মচারী নিয়োগ করেন। তাঙ্ আমলে শাসন ও আইনের সংস্কার হয়েছিল ঠিকই, তবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছিল সামান্যই। কর্মচারী নিয়োগের জন্য সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ছিল আগের মতই। প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের যোগ্যতা অনুসারেই নিয়োগ করা হত। তাঙ্ আমলে অবশ্য এর কিছু উন্নতি সাধন করা হয়।

এ যুগে বৌদ্ধ শ্রমণদের চিনে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চায় অবদান কম ছিল না। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা এ সময়ে যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছিল। সম্রাটরা অনেকেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, কিন্তু রাজ্য শাসন ব্যাপারে কনফুসীয় পদ্ধতি মত শিক্ষিত সমাজ প্রশাসন ও সমাজের কাঠামো হ্যান ও সুই যুগের মতই রেখেছিলেন। চাকুরীর পরীক্ষায় প্রধান পাঠ্য বিষয় ছিল নীতিধর্ম; আর স্কুলের পাঠ্যতালিকায় কনফুসীয় সাহিত্যাদির প্রাধান্য ছিল। এ যুগে তাও পন্থীরা মুষ্টিযোগ, ভেষজ চর্চা, সঞ্জীবনী রসায়ন প্রভৃতি গবেষণা করতেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চুম্বক-কম্পাস।

তাঙ্ আমলের অনেক বৈশিষ্ট্যর মধ্যে সাহিত্য বিশেষত কাব্যের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। চীনের কাব্য সাহিত্যে এ যুগের বিশেষ এক স্থান আছে। এ যুগের লি পো, তু ফু প্রভৃতি কবিরা সমগ্র চীন সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। এরা দুজনেই সমসাময়িক এবং মিং হুয়াং-এর রাজত্বকালেই (৭১২-৭৫৬ খ্রীঃ) তাদের বিখ্যাত কবিতাগুলি রচিত হয়। ভারতের গুপ্ত যুগের মত চীনের তাঙ্ যুগকে কাব্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। কাব্য ছাড়াও অনেক ছোট গল্পও এ যুগে লেখা হয়েছিল। প্রসিদ্ধ তাঙ্ কবি ইউয়ান চেনের এ ব্যাপারে নাম করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় পাঠ

ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, চা, মুদ্রণ, চিত্রাঙ্কন, মৃৎশিল্প, ভাস্কর্য

তাঙ্ বংশের রাজত্বকালে চীনের স্থলপথ ও জলপথ মুক্ত হওয়ার ফলে উভয় পথেই চীনের সাথে বাইরের জগতের যোগাযোগ হয়েছিল আগের চেয়ে বেশী। ফলে ব্যবসা বাণিজ্যও বেড়েছিল অনেক। এ যুগে চীনের ধনদৌলত সমৃদ্ধির চরম সীমায় পৌঁছেছিল। ফলে বিদেশ থেকে বহু বণিক অর্থ উপার্জনের জন্য এখানে আসত। রাজধানী চাং আন (বর্তমান সিয়ান ফু) ছিল চীন প্রবেশের প্রধান ঘাঁটি। বাণিজ্যের আমদানি রপ্তানি চলত এ পথ দিয়ে। সপ্তম শতাব্দীতে ক্যান্টনে বন্দর বাণিজ্যের কথা জানা যায়। আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রন ও শুল্ক সংগ্রহের জন্য একটি সরকারী দপ্তরও ছিল। ইসলামের অভ্যুত্থানের সাথে সমুদ্র পথে দূরপ্রাচ্যে আরবদের ব্যবসা বাণিজ্যও উন্নতি হয়েছিল এবং তারা ক্যান্টনে একটি উপনিবেশও স্থাপন করে। নবম শতাব্দীতে নেস্টরিয় খ্রীষ্টান ও ইহুদিদের আগমন দেখা যায়। চীনের বড় বড় শহরগুলির অধিবাসীদের অনেকেই রেশমী পোষাক পরত। রেশমের কারখানা-গুলিতে প্রায় এক লক্ষ শ্রমিক কাজ করত। অনেক আগে থেকেই রেশম ছিল চীনের একটি প্রধান রপ্তানী। এ যুগে ভারতে চীন থেকে রেশম আমদানীর কথা শোনা যায়। রপ্তানীর আরও দুটি প্রধান সামগ্রী

হল মসলা ও চীনা বাসন। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে হাতীর দাঁত, তামা, ধূপ, গণ্ডারের সিং, কচ্ছপের চাড়ি প্রভৃতি। সমুদ্রসাথী বণিকেরা অধিকাংশই ছিল বিদেশী।

তাঙ্ আমলে জমি ব্যবস্থার সংস্কার অর্থাৎ প্রজারা যাতে সম-পরিমাণে দেশের জমির মালিকানা পায় সে ব্যাপারে এক পরিকল্পনা নেওয়া হয়। তবে এই জমির পূর্ণবণ্টন ব্যবস্থা ঠিকমত কাজে রূপায়িত করা সম্ভব হয় নাই। জমি কেনাবেচার ফলে বড় বড় জমিদার গোষ্ঠীর সৃষ্টিও বন্ধ করার চেষ্টা সফল হয় নাই। কৃষকদের, বিশেষত জমিহীন কৃষকদের জমি দেওয়ার সরকারী চেষ্টা এ যুগের বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। এরূপ সরকারী চেষ্টায় নানারকমের জলসেচের ব্যবস্থা প্রভৃতিও শোনা যায়। কিন্তু এ সত্ত্বেও এ যুগে দুর্ভিক্ষের কথাও আবার শোনা যায়। দুর্ভিক্ষের সময় অবশ্য আজকালকার মত খাদ্য দেওয়া ও কর মুকুব করা হত। জমি থেকে খাজনা হিসাবে সরকারের পাওনা ভালই হত।

সভ্যতার ইতিহাসে চীন পৃথিবীকে যে কয়টি নূতন জিনিষের সন্ধান দিয়েছে চা পান তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে দক্ষিণ চীনে চা পান প্রথম সুরু হয় ও পরে উভয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। 'চা' শব্দটিই চীনা। ৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে চীনে 'চা সাহিত্য' নামে এক গ্রন্থে লেখক চায়ের মহিমা বর্ণনা করেছিলেন। পরবর্তী কালে চীন থেকে রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে চা এক বিশেষ স্থান পায়।

মুদ্রণ শিল্পেরও প্রথম আবির্ভাব হয় চীনদেশে এবং তাঙ্ বংশের আমলে। তুন হুয়াং গুহা থেকে জগতের প্রাচীনতম ছাপা গ্রন্থ পাওয়া গেছে। চীনদেশে ব্লক প্রস্তুত ও মুদ্রণ এক জাতীয় শিল্পে পরিণত হয়েছিল।

চীনের পণ্ডিত সমাজ ও কোন কোন সম্রাট চিত্রাঙ্কন বিদ্যা চর্চা করতেন। চীনের লিখন 'হায়রোগ্রাইফিক' বা চিত্র লিখন, অক্ষর বা 'আইডিওগ্রাম' প্রত্যেকটি এক একটি ছবি। এ কারণে ক্যালিগ্রাফি বা

'লিখন-বিদ্যা' একটি শিল্পে পরিণত হয়। তাঙ্ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর 'উ তাও জু'কে চীনের র‍্যাফেল বলা হয়।

চীনে মাটির মূর্ত্তি নির্মাণ ছিল প্রাচীন পিতৃপূজার উপাচার। নানা ধরনের মাটির মূর্ত্তি সমাধির মধ্যে পুঁতে রাখা হত। মন্ত্রপূত এই মূর্ত্তিগুলি সমাধিস্থ ব্যক্তির সেবা করবে এরূপ এক বিশ্বাস থেকেই করা হত। তাঙ্ যুগে সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের সমাধির ভিতর এরূপ চাকর, নর্ত্তকী, প্রহরী প্রভৃতির মূর্ত্তি রাখা হত।

তাঙ্ রাজত্বের প্রথম শতাব্দীকে চীন ভাস্কর্যের চরম উন্নতির যুগ বলে মনে করা হয়। সারা বিশ্বের কয়েকটি শ্রেষ্ঠতম ভাস্কর্যের নিদর্শন এই যুগের শিল্পেই দেখা যায়।

তৃতীয় পাঠ

বৌদ্ধ ধর্ম : কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি অঞ্চলে চীনের ভাবধারা

তাঙ্ আমলে ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্র ধরে বহু বিদেশী ও নানাধরনের ধর্মাবলম্বী চীনে আসে। তাঙ্ আমলের পূর্বেও অবশ্য চীনে এরূপ নানা ধর্মের অস্তিত্ব দেখা যায়। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল পারস্যের মাজদা ধর্ম, মনি প্রবর্তিত ধর্ম 'মনিকিজম্', নেস্টোরীয় খ্রীষ্টান ধর্ম ও ইসলাম। চীনে মাজদা ধর্মালম্বীরা ছিল পারস্যে বণিক বা উদ্বাস্তু জাতীয়; কোন চীনা এ ধর্ম গ্রহণ করেছিল বলে মনে হয় না। মনিকিজম্ কোন কালেই চীনাদের কাছে জনপ্রিয় হয় নাই। তাঙ্ যুগে চীনের দক্ষিণ অঞ্চলের বন্দরগুলিতে মুসলমানদের বসতি দেখা যায়। মুসলমানদের সংখ্যা অবশ্য পরে বৃদ্ধি পায়। তবে বাইরে থেকে আসা ধর্মের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের মত অন্য কোন ধর্ম চীনের সংস্কৃতিকে এত গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে নাই। তাঙ্ আমলের প্রথম দিকে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি লক্ষ্য করা যায়। দেশের শাসন ব্যবস্থায় অবশ্য পূর্বের মত তাঙ্ আমলেও স্থানীয় কনফুসীয় পদ্ধতিকে বজায় না রাখা ছাড়া উপায় ছিল না। এ যুগের শাসকরা বৌদ্ধধর্মকে বিশেষভাবে সমর্থন করতেন এবং বৌদ্ধ

তীর্থযাত্রীদের ভারতে যাওয়ার বিরাম ছিল না। এযুগে আবার বৌদ্ধধর্মের নানা মতবাদের উৎপত্তিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে 'চেন-ইয়েন' ('আদর্শ পৃথিবী') নামে যে মতাবলম্বী বা চিন্তাধারার সৃষ্টি হয় তার প্রভাব জাপানেও ছড়িয়ে পড়ে। জাপানে এই মতবাদ সিঙ্গন্ নামে পরিচিত। চীনা শিল্পে বৌদ্ধধর্মের ভাবধারা বিশেষভাবে পরিস্ফুট। তাঙ্ আমলের শেষদিকে অবশ্য চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি আগের মত ছিল না। ভারতে বৌদ্ধধর্মের অবস্থার এ হয়ত প্রতিফলন বলা যেতে পারে। তবে বৌদ্ধধর্মের পরজগতের চিন্তা ও সংসার বৈরাগ্য এর প্রভাব নষ্ট হওয়ার কারণ বলেও অনেকেই মনে করেন। এগুলি ছিল কনফুসীয় নীতির বিরোধী। এ ছাড়া তাই সুং-এর আমলে প্রতি চৌ (জেলা), ও সিয়েনে (মহকুমায়) কনফুসিয়াসের উদ্দেশ্যে মন্দির নির্মাণও এগুলিতে শ্রদ্ধা অর্পনের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে কনফুসিয়ান মতাবলম্বীদের প্রাধান্যই সরকারীভাবে সমর্থন করা হয়। রাজকর্মচারীরা বৌদ্ধধর্মকে দেশীয় তাও ধর্মের সাথে বিদ্বেষের চোখে দেখতে সুরু করে। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে বৌদ্ধধর্মের প্রতি দেশে বিরাট আপত্তি সুরু হয়। ৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট উ সুং-এর আদেশে প্রায় চল্লিশ হাজার বৌদ্ধমন্দির ধ্বংস করা হয়। তবে কয়েক বৎসর পর এ অবস্থার পরিবর্তন হয়। ৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে উ সুং-এর উত্তরাধিকারী সুয়ান সুং-এর রাজত্বকালে এ আদেশ বাতিল করা হয়।

তাঙ্ বংশের রাজত্বকালকে এসব কারণে চীনের ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগ বলে মনে করা হয়। চীনের সংস্কৃতি ও ভাবধারা এযুগে পাশাপাশি জাপান, কোরিয়া, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। বস্তুত এসব অঞ্চলের সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় চীনের আদর্শ অনুকরণের ঝোঁক দেখা যায়। কারণ হ'ল এ অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের দেশকে চীনের মতই তৈরী করতে চেয়েছিল।

চতুর্থ পাঠ

হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ ও চীনে প্রত্যাবর্তন ঃ ফলাফল

ব্যবসাবাণিজ্য উপলক্ষে বহু বিদেশী চীনে আসত, তেমনি আবার ধর্মশিক্ষা, তীর্থ প্রভৃতি ব্যাপারে বহু বৌদ্ধসন্ন্যাসী এযুগে ভারতে আসতেন। এদের মধ্যে হিউয়েন সাঙের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ তার এই ভ্রমণের ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়াও যথেষ্ট ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। আনুমানিক ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে হোনান প্রদেশে হিউয়েনসাঙের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত রাজকর্মচারীর চতুর্থ পুত্র। উনত্রিশ বছর বয়েসে (৬২৯ খ্রীঃ) সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তিনি ভারতের পথে রওনা হন। এ সময়েই অবশ্য বৌদ্ধধর্মের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে তাঁর সুনাম সুরু হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের আদিভূমি ভারতে এসে বৌদ্ধ ধর্মের মূল শাস্ত্র অধ্যায়ন ও বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলির দেখার প্রবল আগ্রহই তাকে সরকারী নিষেধাজ্ঞা ও এতদূর পথের নানা কষ্ট সহ্য করতে উৎসাহ দেয়। হোনান থেকে আফগানিস্থানের কাবুল পর্যন্ত প্রায় তিনহাজার মাইল পথ তিনি 'উত্তরের রাস্তা' ধরে ইস্কুকুল হ্রদ, তাসখন্দ, সমরখন্দ, কান্দাজ প্রভৃতি পার হয়ে গান্ধার অঞ্চলে ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এসে হাজির হন। এই সময় থেকে ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত ভারতের প্রায় প্রতিটি প্রদেশই তিনি ভ্রমণ করেন। ফেরার পথে 'দক্ষিণের রাস্তা' ধরে তিনি পামীর অতিক্রম করেন ও কাশগড়, ইয়ারখন্দ ও লপ্‌নর প্রভৃতি অঞ্চল দিয়ে নিজ বাসভূমিতে পৌঁছান। ৬৩৫ থেকে ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ভারতে হর্ষের সাম্রাজ্যেই কাটান। ভারতে তাঁর লিখিত বিবরণ থেকে সে যুগে ভারতের সমাজ ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক জীবন ও শাসন

হিউয়েন সাঙ

ব্যবস্থার নানা তথ্য জানা যায়। একারণে তাঁর এই বিবরণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। এ সময়ে ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব আগের মত ছিল

না। হিন্দুধর্মপুনরায় শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। তবে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল। এ সময়ে নালন্দা ও তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের

আন্তর্জাতিক খ্যাতি ছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কিছুকাল অধ্যয়নও করেছিলেন। এ ছাড়া এ সময়ে ভারতের শাসন ও সমাজ ব্যবস্থার নানা দিক হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় পাওয়া যায়। তাঁর বিবরণে দাক্ষিণাত্যের কথাও আছে। কারণ উত্তর ভারত ছাড়াও তিনি চালুক্য রাজধানী বাতাপী ও পল্লব রাজধানী কাঞ্চিও দেখে আসেন। এরূপ বেশ কয়েক বছর ভারতে থাকার পর তিনি দেশে ফিরে যান ও সাথে অসংখ্য পাণ্ডুলিপি, মূর্তি ও বুদ্ধদেবের নানা স্মৃতি চিহ্ন সাথে নিয়ে যান। জীবনের অবশিষ্ট বিশ বছর তিনি অধ্যাপনা ও শাস্ত্রগুলির চীনা ভাষায় অনুবাদের কাজে হাত দেন। শোনা যায় তার অনুবাদ গ্রন্থের সমষ্টি আকারে বাইবেলের পঁচিশ গুণ। এই গ্রন্থগুলি চীনে বৌদ্ধধর্মকে বিশেষ জনপ্রিয় করে তুলেছিল। এ কারণে তিনি রাজসম্মানও পেয়েছিলেন। চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রসারে ও ভারতের সহিত চীনের যোগাযোগের ব্যাপারে হিউয়েন সাঙের ভূমিকা বিশেষভাবে মনে রাখার মত।

(খ) সুং বংশের রাজত্বকাল (৯৬০-১২৮০ খ্রীঃ)

পঞ্চম পাঠ

রাষ্ট্রব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা : বাণিজ্য, কৃষি, সম্পত্তি কর

সুং বংশের সম্রাট সেন-সুং-এর রাজত্বকালকে (১০৬৮-১০৮৫ খ্রীঃ) 'বৈপ্লবিক' শাসনের কাল বলা হয়। এর কারণ হল তাঁর আমলে মন্ত্রী ওয়াং আন-সি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে সরকারী নিয়ন্ত্রণ, চাষীদের সরকারী ঋণদান, সম্পত্তি কর প্রভৃতি কয়েকটি জনকল্যাণমূলক সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন। আধুনিক পণ্ডিতরা এই সংস্কারগুলিকে হয়ত সোশ্যালিজম্ (সমাজতন্ত্র) কমিউনিজম্ (সাম্যবাদ) প্রভৃতি আখ্যা দিতে পারেন। তবে এ যুগে সঠিক এ ধরণের ভাবধারায় এই সংস্কারগুলি আসেনি।

বাণিজ্যে সরকারী নিয়ন্ত্রণ—চীনে উৎপন্ন ফসলের অংশ সরকারকে কর হিসাবে দেওয়ার রীতি ছিল। এই শস্য দেশের দূরদূরান্ত থেকে

রাজধানীতে নিয়ে আসতে হত। যানবাহন ও দূর থেকে আনার ফলে পথে কিছু ফসল নষ্ট হত; আর রাজধানীতে একসাথে এ ফসল বেশ কমদামেই বিক্রী করা হত। আবার দূর অঞ্চলে যেখানে খাদ্যের অনটন সেখানে শস্য অগ্নিমূল্য হয়ে উঠত। এতে সরকারের আর্থিক ক্ষতি ছাড়া দরিদ্র জনসাধারণের দুর্দশার সীমা থাকত না। মন্ত্রী ওয়াং আন-সি এক নূতন নিয়ম করলেন। প্রত্যেক জেলায় রাষ্ট্রের নিজস্ব শস্য গোলা স্থাপন করা হল; আর এই গোলায় স্থানীয় করলব্ধ সব শস্য মজুত রাখার ব্যবস্থা হল। প্রয়োজন হলে অন্যত্র পাঠিয়ে এ শস্য বিক্রী করা হত। এ যুগে শস্যই ছিল বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান পণ্য। সরকারের এভাবে ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করার ফলে চাষীরা উদ্বৃত্ত শস্যের ন্যায্য দাম পেত, আর শস্যের ক্রয়বিক্রয় সরকারের হাতে থাকার ফলে বাজরে এর দাম যথেচ্ছ ভাবে বাড়তেও পারত না। রাষ্ট্রও অর্থলাভ করত, যেটা জনসাধারণেরই উপকারে আসত। দরিদ্র চাষী ও জনসাধারণ এ ব্যবস্থার সমূহ উপকারই পেত। কারণ শস্য লুকিয়ে বাজারে অভাব সৃষ্টি ও পরে বেশী দামে বিক্রী প্রভৃতি এ ব্যবস্থায় হতে পারত না।

রাষ্ট্র কর্তৃক কৃষি ঋণ দান: সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে চাষীদের বাঁচাবার জন্য এ সময়ে চাষীদের সরকারী ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। চাষের কাজ আরম্ভ করবার সময় চাষীরা সরকারের কাছে জমি বন্ধক রেখে ঋণ নিত। ফসল তোলার পর সুদ সমেত তারা এই ঋণ শোধ করে দিত। এর ফলে চাষীরা মহাজনদের প্রাণান্তকর সুদের হার থেকে অব্যাহতি পায়। এ ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট কম পরিমাণ সুদ দেওয়ার ফলে চাষীদেরও আর্থিক অবস্থা ভাল হয় ও তাদের মধ্যে নিরাপত্তার ভাব আসে।

সম্পত্তি কর—এ আমলে প্রত্যেক সিয়েনের (মহকুমার) কর্মচারীদের ঐ অঞ্চলের প্রজাদের সম্পত্তির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সম্পত্তির ফিরিস্তি দাখিল করতেও বলা হয় এবং এরপর এক নির্দিষ্ট হারে কর ধার্য করা হয়।

দেশের সম্পত্তির সুষ্ঠু বণ্টন ও একই ব্যক্তির হাতে প্রচুর সম্পত্তি যাতে না থাকে সে উদ্দেশ্যেই এরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

ষষ্ঠ পাঠ
শিক্ষা ও সংস্কৃতি

ভারতে বৌদ্ধধর্মের মহৎ নীতিগুলি দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। চীনের কন্‌ফুসীয় নীতিগুলির অবস্থাও এরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই অবস্থায় প্রাচীন কন্‌ফুসীয় নীতিগুলির সহজ ব্যাখ্যা ও জনসাধারণের বোধগম্য করার প্রয়োজন হয়। এ যুগে লাওৎসির তাও দর্শন ও বৌদ্ধ চ্য'ান তত্ত্বের সাথে কন্‌ফুসীয় নীতিধর্মের এক সংমিশ্রন ঘটে। এরই ফলে এক নূতন নীতির সৃষ্টি হয়। আর এ যুগে দর্শন চিন্তা এক সাংস্কৃতিক জাগরণের সৃষ্টি করেছিল। এই ধারা প্রায় সাত'শ বছর ধরে মিং যুগ পর্যন্ত চলেছিল। এ যুগের নূতন ও প্রাচীন দার্শনিক দল রাজনীতিতে অবশ্য চুপচাপ ছিলেন না। সম্রাট সেন সাং-এর আমলে মন্ত্রী ওয়াং আন-সির সংস্কার গুলিতে এই দুই সাংস্কৃতিক দলের ভূমিকা লক্ষ্য করার মত।

এ যুগে কন্‌ফুসীয় নবদর্শন ও তার বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনা গ্রন্থ ছাড়া নানা ধরনের পদ্য, প্রবন্ধ, ইতিহাস গ্রন্থের প্রাচুর্য দেখা দিয়েছিল। ইতিহাসের প্রতি চীনাদের আকর্ষণ চিরদিনের। পণ্ডিতরা ইতিহাসকে প্রাচীন শাস্ত্রের অঙ্গ বলেই মনে করতেন। কন্‌ফুসিয়াস্ নিজেই 'সু কিং' নামে একটি ইতিহাস বই লিখেছিলেন। তারপর প্রতিযুগে ইতিহাস রচনা অব্যাহত ছিল। এর প্রমাণ হল সমসাময়িক ঘটনা, রাজ দরবারে অনুষ্ঠান প্রভৃতি নিয়মিত লিখে রাখার অভ্যাস। এ যুগের একটি বিশেষ ধরনের রচনা হল বিশ্বকোষ (ইংরেজীতে যাকে বলে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া)। 'তাই পিং ইউ লান' নামে এ যুগের বিশ্ব কোষটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তা'ঙ্ যুগকে কবিতার স্বর্ণযুগ বলে ধরা হয়, কিন্তু কথা সাহিত্যে সুংযুগ ঐ যুগকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ইতিহাস, প্রাচীন সাহিত্য, পদ্য ও গদ্য রচনা ছাড়া সুং যুগে জ্যোতির্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, গণিতশাস্ত্রেও নানা গ্রন্থ রচিত হয়।

(গ) ইউয়ান্ বংশের রাজত্বকাল (১২৮০-১৩৬৮ খ্রীঃ)

সপ্তম পাঠ

মোঙ্গলজাতি ঃ কুব্লাই খাঁ

বর্তমান সাইবেরিয়া অঞ্চলে বৈকাল হ্রদের দক্ষিণে মোঙ্গলদের আদি বাসভূমি ছিল বলে মনে করা হয়। সম্ভবত এরা ছিল হূণ জাতিরই বংশধর। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এরা নানা উপদলে বিভক্ত হয়ে বসবাস করত। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তামুজিন নামে এক দলপতি সব মোঙ্গলদের নিয়ে এক শক্তিশালী জাতি গড়ে তোলেন। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র মঙ্গোলিয়াতে যখন তামুজিন নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন সে সময় তিনি 'চেঙ্গিস খাঁ' বা 'সার্বভৌম সম্রাট' বলে পরিচিত হলেন। কারাকোরাম নগরে তিনি রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। মঙ্গোলিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শাসন কায়েম করে চেঙ্গিস চীনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল আক্রমণ করে সি-সিয়াদের বশ্যতা আদায় করলেন। এরপর তিনি চীনের উত্তর পূর্বাঞ্চল আক্রমণ করে কিন্ বা জুচেনদের হারিয়ে রাজধানী ইয়েন চিং (পিকিং) দখল করলেন। ১২১৯ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গলরা কোরিয়া জয় করল ও এর পর তারা পশ্চিমদিকে রাজ্য জয়ে মন দিল। হূণদের মত এদেরও হিংস্রতা, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ সর্বত্রই এক ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে চেঙ্গিসের মৃত্যু হয়। তাঁর তিন পুত্র ও এক পৌত্রর মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগাভাগি হয়। এর দীর্ঘকাল পর চেঙ্গিসের পৌত্র মঙ্গু মোঙ্গলদের অধিনায়ক হন। তিনি এক ভাই কুব্লাই খাঁকে হোনান অধিকারের জন্য পাঠান। ১২৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গুর মৃত্যু হয়। এ সময়ে কুব্লাই খাঁ ইয়াংসি পার হয়ে সুং সাম্রাজ্য দখল করবার জন্য আগিয়ে যাচ্ছিলেন। ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি সুংদের সাথে সন্ধি করে কারাকোরামে ফিরে গেলেন। ইতিমধ্যে আরিকবুগাও নামে কুব্লাইয়ের

আর এক ভাই সিংহাসন দখল করে নিয়ে ছিলেন। তিনি তাকে অপসারিত করে নিজে সিংহাসন দখল করলেন (১২৬১ খ্রীঃ)।

সুং সম্রাট কুব্‌লাই খাঁর সাথে যে সন্ধি করেছিলেন তা ভঙ্গ করেন। ফলে কুব্‌লাই পুনরায় চীন আক্রমণে আগিয়ে আসেন। স্থুংদের পরাস্ত করে মহাচীনের একছত্র অধিপতিরূপে তিনি ইউয়ান্ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করলেন। কারাকোরাম থেকে পিকিংএ রাজধানী স্থানান্তরিত করা হল। এই নগরটির পরিকল্পনা তিনিই করেছিলেন। মোঙ্গলরা এর নাম দিয়েছিল 'খান্‌বালিগ' অর্থাৎ খাঁ শহর। কুব্‌লাইয়ের চীনা নাম সিস্থু। তাঁর রাজত্বকালকেই চীনে মোঙ্গল শাসনের স্বর্ণযুগ বলা হয়। তাঁর জাপান অভিযান দু'বারই ব্যর্থ হয়। ব্রহ্মদেশে কুব্‌লাইয়ের সামরিক অভিযান অপেক্ষাকৃত সাফল্য মণ্ডিত হয়, কিন্তু এ বিজয় স্থায়ী হয় নাই। কুব্‌লাই বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন বটে, কিন্তু সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন করতে পারেন নি। এর ফলেই মোঙ্গলদের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের গরিমাও নষ্ট হয়।

কুব্‌লাই খাঁ

যুদ্ধ জয় ও সাম্রাজ্য বিস্তার ছাড়াও অপর কয়েকটি বিশেষ গুণের জন্য কুব্‌লাই ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। বিদেশী হয়েও তিনি চীনা পণ্ডিতদের কাছেই শিক্ষা লাভ করেন ও তার রুচির পরিবর্তন হয়।

তিনি নিজে তিব্বতী বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন ; কিন্তু তার পরধর্ম-সহিষ্ণুতা ও বিশ্বপ্রেম অর্থাৎ বিদেশীদের প্রতি সহানুভূতি বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। জনহিতকর কাজেও কুব্‌লাইয়ের সুনাম আছে। এক হাজার মাইল দীর্ঘ যে বৃহৎ খাল সুই সম্রাটরা খনন করেছিলেন কুব্‌লাই তার সংস্কার করেন। এছাড়া কয়েকটি রাজপথ নির্মাণ করে তিনি ডাক চলাচলের সুবিধা করেন। তিনি জনশিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন ও একটি শিক্ষায়তন স্থাপন করেন। এর ভার তিনি চীনা পণ্ডিতদের হাতেই অর্পণ করেছিলেন।

অষ্টম পাঠ
মার্কোপোলোর বিবরণ

কুব্‌লাই খাঁয়ের আমলে দু'জন ভিনিসীয়, নিকোলো পোলো ও তার ভাই মাফিও পোলো চীনে এসেছিলেন। নিকোলো তার একুশ বছরের ছেলে মার্কোপোলোকেও সাথে নিয়ে এসেছিলেন (১২৭৫ খ্রীঃ)। মার্কোপোলোর বিবরণ থেকেই ইউরোপ চীন সম্বন্ধে নানা তথ্য জানতে পারে। কুব্‌লাই খাঁ এদের দূত হিসাবে পোপের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কুব্‌লাই পোপকে এদের মারফত এক চিঠিতে কয়েকজন শিক্ষক চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। পোপ মাত্র দু'জন ধর্ম শিক্ষক পাঠিয়ে দিলেন ; তবে তারাও আবার চীন পর্য্যন্ত পৌঁছাতেই পারেননি। দ্বিতীয়বার চীন যাওয়ার পথে পোলো ভ্রাতৃদ্বয় মার্কোপোলোকে সাথে নিয়ে পারস্য উপসাগর পার হয়ে পারস্য ও তারিম উপত্যকার পথে চীনে পৌঁছান। এরপর মার্কোপোলো রাজকাজে নিযুক্ত হন ও চীনের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সাথে বিশেষ পরিচিত হন। এভাবে পনের বছর কাটাবার পর সমুদ্র পথে সুমাত্রা, দক্ষিণ-ভারত হয়ে পারস্যে পৌঁছান ও সেখান থেকে ভেনিস পৌঁছান। কিছুকাল পর তিনি যুদ্ধবন্দী হিসাবে জেনোয়ায় কারাগারে থাকেন। এখানেই তিনি জনৈক সহচরের কাছে তার ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনা করেন। এভাবে তাঁর ভ্রমণ কাহিনী রচিত হয়।

মার্কো পোলো কিছুকাল হ্যাং চৌর গভর্ণর ছিলেন। এই নগরটিকে তিনি ইউরোপের যে কোন শহরের চেয়ে বেশী সুন্দর বলে বর্ণনা
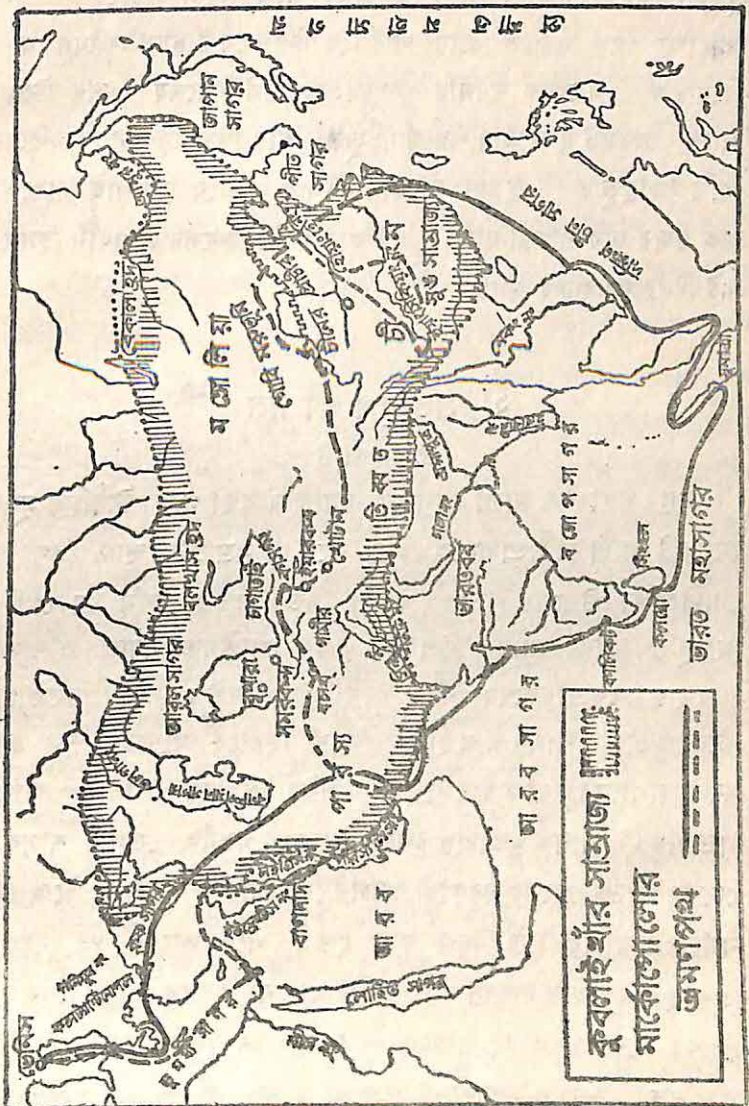
করেছেন। তাঁর বর্ণনায় খানবালিগ (পিকিং) শহরের বর্ণনাও আছে। কুব্‌লাই খাঁর প্রাসাদটি ছিল মর্মর পাথর দিয়ে ঘেরা, জানালাগুলি কাঁচের। মার্কো বলেছেন যে এত সমৃদ্ধ শহর তিনি পূর্বে আর

দেখেন নি। এছাড়া মার্কোর বর্ণনায় কুব্‌লাই খাঁ আমলের শাসন পদ্ধতি, সাম্রাজ্যের অবস্থা প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। কুব্‌লাইয়ের সাম্রাজ্যকে তিনি স্বর্গরাজ্য বলে বর্ণনা করেছেন। এই স্বর্গরাজ্য গড়ে তুলতে প্রায় পাঁচ কোটিরও বেশী চীনা জীবন বলি দিয়েছিল। মার্কোর বর্ণনায় কুব্‌লাইয়ের দুটি বিশেষ গুণের উল্লেখ আছে। প্রথমটি হ'ল তাঁর পরধর্মসহিষ্ণুতা, আর দ্বিতীয়টি হল বিদেশীদের প্রতি সহানুভূতি। সুতরাং মার্কোর বর্ণনায় এভাবে কুব্‌লাই আমলের এক সুন্দর ছবি পাওয়া যায়। এই কারণে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এই বিবরণের গুরুত্ব আছে।

(২) মধ্যযুগে জাপান

প্রথম পাঠ

সপ্তম শতাব্দীর আগে জাপানের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল মূলত কয়েকটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে। সম্রাটের স্থান ছিল এই গোষ্ঠীগুলির উপরে। তার ক্ষমতা নির্ভর করত তিনি যে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তার ক্ষমতার উপর। এরূপ গোষ্ঠীগত সমাজ ও শাসন-ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণের ঝোঁক দেখা যায় বেশী। এর প্রতিকারের উদ্দেশ্যে চীনের শাসন ব্যবস্থাকে আদর্শ হিসাবে অনুকরণ সুরু হয়। ফলে জাপানের সমাজ ব্যবস্থায় দুটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়—শাসক ও শাসিত সম্প্রদায়। শাসক সম্প্রদায় বলতে প্রদেশের গভর্নর, জেলার শাসক ও দেশের বিভিন্ন স্থানের সরকারী কর্মচারীদের বোঝায়। প্রথম দিকে এসব কর্মচারীদের চাকুরীতে নিযুক্ত করা হত। পরে তাদের এই পদগুলি বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়ায়। চাকুরীর মাহিনা হিসাবে এরা ধানের জমি পেত। দেশের বাকী ধানের জমি সাধারণ লোকেদের মধ্যে বিলি করা হত। শাসক সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে অবশ্য এ জমিগুলির জন্য কোন কর বা খাজনা দিতে হতনা। অন্যদের কিন্তু দিতে হত। দেশের অন্যান্য জমিগুলি যারা কিনে নিত তাদের হাতেই থাকত। এ ব্যবস্থার ফলে আস্তে আস্তে বড় বড় জমিদারী সৃষ্টি হতে লাগল। অনেক ক্ষেত্রে

আবার সাধারণ লোকেরা ধানের জমির খাজনা ঠিকমত দিতে না পেরে শাসকদের কাছে বিক্রী করতেন, কারণ তাদের খাজনা দিতে হতনা। এভাবে শাসকরা জমিদার শ্রেণীতে পরিণত হতে লাগল। বড় বড় জমিদারী সৃষ্টির সাথে তাদের জমিদারী ঠিকমত রাখার জন্য সেনাবাহিনী পুষতে হত, আর কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থাও দুর্বল হতে লাগল। যে সব লোক তাদের জমি ছেড়ে দিল; তারা জমিদারের কাছে চাকরী গ্রহণ করতে লাগল। জমিদারদের মধ্যেও সম্পত্তি রক্ষা সম্পত্তির বৃদ্ধি প্রভৃতি মনোভাবের ফলে তাদের মধ্যেও বিবাদ সুরু হল। এ কারণেও সেনাবাহিনীর দরকার হল। ইউরোপের মত জাপানেও এভাবে সামন্ত প্রথার সৃষ্টি হল। শাসক শ্রেণীর মধ্যেও আবার দুটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এর একটি হল অসামরিক আর অপরটি হল সামরিক অভিজাত বা সামন্ত সম্প্রদায়। প্রথম শ্রেণীর কাজ হল সম্রাট তথা কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা, আর দ্বিতীয় শ্রেণী মূলত প্রদেশগুলিতে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে থাকত। কেন্দ্র থেকে প্রদেশগুলিতে এসব শাসকদের পাঠান হলেও তারা প্রাদেশিক সামন্তদের শক্তির উপর নির্ভর করে কাজ চালাত। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে এভাবে সম্রাটের ক্ষমতা সামন্তদের হাতে চলে যেতে লাগল। ফলে জাপানের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন দেখা দিল। ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত সামন্ত ব্যবস্থায় জাপানে এক কেন্দ্রীভূত শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখা যায়। তবে সম্রাটপদ কখনই তুলে দেওয়া হয় নাই। এযুগে সামন্তদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশী ক্ষমতার অধিকারী হতেন সম্রাট তাকেই 'সোগান' অর্থাৎ 'সম্রাট বা সরকারের প্রধান হস্ত' উপাধিতে ভূষিত করতেন। দেশের আসল ক্ষমতা এর হাতেই থাকত। তবে এ অবস্থাতেও সম্রাটই ছিলেন দেশের প্রধান ও সর্বময় কর্তা। তাকে ঈশ্বরের প্রতিভূ বলেই মনে করা হত ও জাপানে নানা পরিবর্তনের মাঝেও সম্রাটপদ কখনও তুলে দেওয়া হয়নি। জাপানে এযুগে শাসন ব্যবস্থা ভারতে মারাঠাদের পেশোয়াতন্ত্রের সাথে মিল দেখা যায়।

দ্বিতীয় পাঠ

চীনের প্রভাব ঃ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীদের বাধাদান

বিশালদেশ চীনের কাছেই জাপানের অবস্থিতি। সুতরাং জাপানের সমাজ, শাসন, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি প্রায় সব ব্যাপারেই চীনের প্রভাব থাকা অতি স্বাভাবিক। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে চীনে সুই ও তাঙ্ বংশের রাজত্বকালে চীনের শক্তি ও গরিমা বৃদ্ধি পায় ও জাপানের সাথে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারী কাজ, শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতির মাধ্যমে জাপান ও চীনের মধ্যে লোক যাতায়াত বাড়তে থাকে। চীনে পাঠরত জাপানী ছাত্ররা দেশে ফিরে চীনা ভাবধারায় জীবন যাপন পছন্দ করে। বলতে গেলে এযুগে চীনের ভাবধারায় জাপানের সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রভৃতি সব স্তরেই যে বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয় তা উনবিংশ শতাব্দীর জাপানে পশ্চিমী ভাবধারাকেও ম্লান করে দেয়। জাপানে চীনের এই অনুপ্রবেশ অবশ্য শাসক গোষ্ঠীর সমর্থন ছিল। তবে চীনের প্রভাবে জাপানে যে সবকিছুরই পরিবর্তন হয়েছিল তা নয়। পুরানো দিনের অনেক কিছুই এই পরিবর্তনের মাঝেও টিকে ছিল। রাজতন্ত্র, পুরানো রাজবংশ ও অনেক গোষ্ঠী এই পরিবর্তনের পরেও টিকে থাকল। এই পরিবর্তন আবার হঠাৎ আসেনি। দীর্ঘ কয়েকশ বছর ধরে ধীরে ধীরেই এই পরিবর্তন ঘটেছিল। চীনা সংস্কৃতি বা ভাবধারা জাপানে যে পরিবর্তন এনেছিল তাকে বিপ্লবের অখ্যাই দেওয়া যায়।

চীনের তুলনায় জাপান আয়তনে অনেক ছোট ও এখানের শাসন ব্যবস্থায় অভিজাতদের প্রাধান্য মেনে নেওয়ার রীতি গড়ে উঠেছিল। এই ধারা বংশানুক্রমিক চলে আসছিল। সম্রাটপদও চিরকাল একই গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। চীনের ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। এখানে সরকারী চাকুরী পরীক্ষার মাধ্যমে অর্থাৎ মেধার উপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে যে কোন ব্যক্তিই উচ্চপদে তার দক্ষতা দিয়ে উঠতে পারত। জাপানে চীনের অনুকরণে শাসন ব্যবস্থার চেষ্টা হয়। এ ব্যাপারে রাজকুমার তাই-সির নাম উল্লেখযোগ্য। জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তনেও

তার বিশেষ ভূমিকা ছিল। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সারা দেশে নূতন সংস্কার প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে আদেশ জারি করা হয়। এজন্য একছর কয়েকটিকে (৬৪৫-৫০ খ্রীঃ) জাপানের ইতিহাসে 'টাইকোয়া' বা সংস্কারের যুগ বলা হয়। অবশ্য এ সময়ের পরিকল্পিত সংস্কারগুলিকে ঠিকমত রূপদান করতে পারলে জাপানের রাষ্ট্র ও অর্থনীতিতে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটত। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে নূতন আইন-বিধি ও চীনের অনুকরণে কিছু কিছু প্রশাসনিক সংস্কার করা হলেও এ যুগের সংস্কারগুলিকে ঠিকভাবে রূপদান করা যায় নাই। এর প্রথম ও প্রধান কারণ হল প্রথম থেকেই জাপানের বড় বড় গোষ্ঠীগুলির নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সংস্কারে বাধাদান। ফলে নূতন ব্যবস্থায় অভিজাতদের প্রাধান্য বজায় রাখা হল, আর সরকারী কর্মচারী নিয়োগে চীনের পদ্ধতি ঠিকমত গ্রহণ করা হল না।

জাপানের উপর চীনের প্রভাবের আর এক উদাহরণ হল ভাষা ও সাহিত্য। এ ব্যাপারে জাপান চীনের কাছে প্রত্যক্ষভাবে ঋণী। জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারেও চীনের প্রভাব ছিল।

তৃতীয় পাঠ
সম্রাটপদ

জাপানে সম্রাটপদের সাথে পৃথিবীর আর কোন দেশের সম্রাট পদের তুলনা করা যায় না। এ কারণে একে অদ্বিতীয় বলা যায়। সভ্যতার আদি থেকে আজ পর্য্যন্ত এরূপ একই বংশে রাজপদ সীমাবদ্ধ থাকার ঘটনা বিরল বললেই চলে। জাপানী সম্রাটরা মিকাডো নামে পরিচিত। মধ্যযুগে চীনের সভ্যতা জাপানের প্রায় সব স্তরেই কিছু না কিছু পরিবর্তন এনেছিল। আবার এযুগে জাপানে শাসনক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, সামন্ত ও সামরিক প্রথা প্রভৃতিতে সম্রাটের ক্ষমতা যথেষ্ট কমে গিয়েছিল সত্য, কিন্তু এই পদও আদিকাল থেকে যে বংশ জাপানে রাজত্ব করছিল তা নষ্ট করা হয় নাই। জাপানীদের রক্ষণশীল

মনোভাবকেই এজন্য দায়ী করা যায়। সম্রাটপদের মত জাপানের আদিধর্ম সিন্টোবাদকেও এ কারণে জাপানে কোনদিনই অস্বীকার করা হয় নাই। জাপানের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা উপকথা ও রূপকথার প্রচলন আছে। সাধারণত সূর্য থেকেই এদেশ সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে করা হয়; আর সম্রাটকে এর প্রতিভূ হিসাবেই ভক্তি করা হয়। সিন্টোবাদ সরকারী আনুকল্য লাভ করত। সম্রাটকে এ ধর্মের প্রধান পুরোহিত হিসাবেই দেখা হত। ফলে তিনি জাতির বৈষয়িক ও ধর্মীয় জীবনের সর্বোচ্চ পদে বিরাজ করতেন। তবে জাপানীদের এই রক্ষণশীলতা অর্থাৎ পুরানো ভাবধারাকে অব্যাহত রাখা মানেই এ নয় যে তারা পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিল না। বস্তুত পুরানো ধারাকে অব্যাহত রেখেই অপরিহার্য ব্যাপারগুলিকে গ্রহণ করাই হল এদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। একারণে দেখা যায় যে দেশের প্রকৃত শাসন ক্ষমতা অন্য হাতে থাকা সত্ত্বেও সম্রাটপদ কখনই নষ্ট করা হয় নাই। উদাহরণ হিসাবে ফুজিয়ামাদের ক্ষমতা দখল করা সত্ত্বেও এ বংশের কেউ সিংহাসন দখল করে নাই। তারা সম্রাটের বংশও নষ্ট করে নাই। অপরপক্ষে সম্রাট বংশের সাথে এ বংশের কন্যাদের বিয়ে দেওয়ার রীতি প্রচলন করে। ক্ষমতার উৎস হিসাবে তারা সম্রাটের উপরেই নির্ভর করতেন। সোগানতন্ত্রেও ক্ষমতার উৎস ছিল সম্রাট। তবে সামন্ততন্ত্র তথা সামরিক বা সোগানতন্ত্রে শাসন ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে। কোন সম্রাট অবশ্য স্বাধীনভাবে কাজ করতে চাইলে তাকে সরে যেতে হত এবং তার বংশের অন্যজনকে এ পদ দেওয়া হত। বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের ফলে সিন্টোবাদের মত সম্রাট পদের কোন ক্ষতি হয় নাই সত্য, তবে একে কেন্দ্র করে ক্ষমতা লাভের জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব শুরু হয়। উদাহরণ হিসাবে রাজসভার সিন্টো গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ধর্ম সমর্থনকারী সোগা গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব উল্লেখ করা যায়। এরূপ গোষ্ঠী কলহ অবশ্যই সম্রাট পদের পক্ষে ক্ষতি-কারক ছিল।

চতুর্থ পাঠ
সোগানতন্ত্র : সামুরাই

কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা ও সামন্ত প্রথার উৎপত্তির সাথে জাপানে এক সামরিক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। একে সামন্ত প্রথার অঙ্গ বলা যায়। ইউরোপের সামন্ত ব্যবস্থাতেও এরূপ সামরিক শ্রেণীর সৃষ্টি আমরা দেখেছি। জাপানে নানা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের কথাও আগে বলা হয়েছে। সামন্ত প্রথায় এই নানা গোষ্ঠী সময়ের সাথে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর সৃষ্টি করে। জাপানী ভাষায় জমিদার বা সামন্তদের এই সেনা বাহিনী 'সামুরাই' নামে পরিচিত আর সামন্তদের 'ডায়মিও' বলা হত।

এ যুগে জাপানে এরূপ দু'টি প্রধান গোষ্ঠীর নাম পাওয়া যায়, যেমন তেইরা ও মিনেমাতো। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সুরু হয়। শেষ পর্য্যন্ত মিনেমাতো দলের ওরিতোমো জাপানের ক্ষমতা দখল করে। তবে দেশের ধারা অনুযায়ী তিনি সম্রাটপদের বা রাজবংশের অবসান চাননি বা ঘটান নি। অন্যদিকে তিনি আবার সম্রাটের কাছ থেকেই তাঁর পদের স্বীকৃতি লাভের চেষ্টা করেন। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাষ্ট্রের সামরিক ব্যবস্থার প্রধান অর্থাৎ 'সোগান' উপাধি পান। এর ফলে আইনগত ভাবেই ওরিতোমো সারা দেশের সামরিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রনের অধিকার লাভ করেন। এই উপাধিদান অবশ্য নূতন নয় বা ওরিতোমোর জন্যই এ উপাধি সৃষ্টি হল তা নয়। অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিক থেকে এরূপ এক প্রথা চলে আসছিল। তবে ওরিতোমোর আমলের বৈশিষ্ট হল ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে তার এই উপাধি পাওয়ার সময় থেকে তিনি যে শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন তাকে সোগানতন্ত্র (ইংরাজীতে সোগানেট, জাপানীতে বাকুফু) বলা হয়। এ ব্যবস্থা অবশ্যই শাসনতন্ত্রে সামরিক আধিপত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কামাকারু অঞ্চলে ওরিতোমো তার শাসনতন্ত্রের প্রধান দপ্তর স্থাপন করলেন। প্রদেশগুলিতে সামরিক গভর্নর (সুগো) নিযুক্ত হল, আর সমস্ত আবাদ-যোগ্য জমিতে কর আদায়ের জন্য 'জিটো" নামে কর্মচারী

নিযুক্ত করা হল। তবে সোগানতন্ত্রের বিধি ব্যবস্থা জাপানের পুরানো আমলের ব্যবস্থাগুলিকে নষ্ট করে দেয়নি। সম্রাট পদের মর্য্যাদা, সম্রাটের বিচার ক্ষমতা ও তাঁর জমিজমা সোগানতন্ত্রের বাহিরে রাখা হয়। এ ব্যবস্থার সাথে মারাঠাদের পুণায় পেশোয়াতন্ত্রের মিল আছে। কারণ পুণায় পেশোয়া, সাতারার ছত্রপতির অধীন ছিলেন, তেমনই কামাকারুতে 'সোগান' কিয়োটায় সম্রাটের কাছ থেকে নীতি প্রবর্তনের ব্যাপারে অনুমতি নিতেন।

জাপানে এ সময় থেকেই পরবর্তী দীর্ঘকালের জন্য সামরিক শাসন চলতে থাকে। জাপানের এই সামরিক শাসনব্যবস্থা চীনের শাসনব্যবস্থার ঠিক বিপরীত। জাপানের সাথে এ ব্যাপারে পশ্চিম ইউরোপের যথেষ্ট মিল আছে। এ কারণে অনেকে মনে করেন যে উনবিংশ শতাব্দীতে জাপান এত তাড়াতাড়ি পশ্চিমী ভাবধারাকে গ্রহণ করতে পেরেছিল।

পঞ্চম পাঠ

বুসিদো (জাপানের শিভ্‌ল্‌রী প্রথা)

জাপানীভাষায় 'বুসিদো,' ইউরোপের 'শিভ্‌লরী' প্রথার অনুরূপ বলা যায়। ইউরোপে 'নাইট হুড' প্রথার মত জাপানের 'বুসিদো'কে সামরিক ব্যবস্থার কয়েকটি আইন কানুন ও সেই সাথে ব্যবহার বিধি বলা যায়। জাপানে এই প্রথার দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ফলে এর ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করার মত। সিন্টোবাদ, কুন্‌ফুসিয়াসের নীতি, বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতির দর্শনসমূহের কিছু কিছু ভাবধারা এ প্রথায় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এর মূল কথা হল গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য। শিষ্টাচার, মৃদুভাষী, মান-মর্যাদা, সদালাপ প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলিকে প্রত্যেকের আয়ত্ত করা এই প্রথার অবশ্য করণীয় ধর্ম। জাপানীদের জীবনযাত্রায় এ গুণগুলি বিশেষভাবে চোখে পড়ে। ফলে জাপানের 'বুসিদো' ও ইউরোপে 'শিভল্‌রী' ঠিক সব ক্ষেত্রে এক নয়। এর আদর্শ নিয়মাবলী প্রভৃতি আলোচনা করলে দেখা যায় যে পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত

হয়েও আজকালকার জাপানীরা এই গুণগুলিকে নিজেদের জীবনধারা থেকে বাদ দেয়নি। ফলে 'বুসিদো' কোনরূপ ধর্ম না হয়েও এক বিশেষ দর্শন বা মতবাদের সৃষ্টি করেছে। এ কারণে একে এক কথায় সভ্যতার ব্যবহার বিধি বলা যায়।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions)

১। চীনে সুইবংশ কতকাল রাজত্ব করেছিল ?
২। চীনে তাঙ্ বংশের রাজত্বকাল কত বৎসর স্থায়ী হয়েছিল ?
৩। কবি ইউয়ান চেন কোন্ আমলের লোক ?
৪। কোন্ গুহা থেকে পৃথিবীর প্রাচীনতম ছাপা গ্রন্থ পাওয়া গেছে ?
৫। হিউয়েন্-সাঙ্ কত খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ?
৬। চেঙ্গিস খাঁ কোথায় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন ?
৭। কোন শহরটি 'খান বালিগ' নামে পরিচিত হয় ?
৮। মার্কোপোলো কোন দেশীয় লোক ছিলেন ?
৯। জাপানের সম্রাটরা কি নামে পরিচিত ?
১০। জাপানে সামন্তদের কি নামে পরিচিত ছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন (Short Essay Type)

১। চীনে তাঙ্ রাজত্বকালকে কাব্যের স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন ?
২। হিউয়েন-সাঙ্ কি উদ্দেশ্যে ভারত ভ্রমণ করেন ?
৩। চীনে কোন্ আমলে চাষীদের সরকারী ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা হয় ?
৪। কুব্‌লাই খাঁ কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন ?
৫। জাপানের ইতিহাসে 'টাইকোয়া' বলতে কি বোঝায় ?
৬। 'বুসিদো' প্রথার সাথে কিসের মিল দেখা যায় ?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন : (Short Essay Type)

১। চীনের সুং বংশের রাজত্বকালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
২। কুব্‌লাই খাঁর রাজত্বকালের বৈশিষ্টগুলি আলোচনা কর।
৩। জাপানের সম্রাটপদ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

একাদশ অধ্যায়
মধ্যযুগে ভারতবর্ষ
(ক) গুপ্তোত্তর যুগে ভারত (পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দী)
প্রথম পাঠ
হূণ অনুপ্রবেশ : ঐতিহাসিক গুরুত্ব

হূণদের কথা আগে বলা হয়েছে। শ্বেত বা সাদা হূণ নামে এদের এক শাখা গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্তের আমলে (আঃ ৪৫৫-৪৬৭ খ্রীঃ) আমাদের দেশ আক্রমণ করে। এদের অমানুষিক অত্যাচার ও বর্বরতার ফলে সারাদেশে এক আতঙ্কের সৃষ্টি হয় ও গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংস হবার উপক্রম হয়। তবে স্কন্দগুপ্তের কাছে হেরে গিয়ে এরা পারস্যের দিকে চলে যায়। পারস্যরাজ এদের সাথে যুদ্ধে হেরে যান (৪৮৪ খ্রীঃ)। ফলে পারস্য, কাবুল প্রভৃতি অঞ্চল এদের দখলে আসে। এ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে তাদের মনোবল ফিরে আসে। পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ও ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে দলপতি তোরমানের নেতৃত্বে এরা ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাজ্য বিস্তার করে। কাশ্মীর, মালব, উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশ হূণরা নিজেদের দখলে আনে। তোরমানের পুত্র মিহিরকুল অমানুষিক বর্বরতার জন্য কুখ্যাত হয়ে আছেন। পারস্য থেকে মধ্য এশিয়ার খোটান অঞ্চল পর্যন্ত এদের রাজ্য বিস্তৃত হয় ও আফগানিস্তানের ব্যামিয়ান অঞ্চলে এ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বলে মনে করা হয়। মিহিরকুলের পরও হূণ রাজারা উত্তর-পশ্চিম ভারত ও মালবে আরও এক'শ বছর রাজত্ব করেন ও ধীরে ধীরে তাদের বংশধররা ভারতীয় হয়ে যান।

ভারতের ইতিহাসে হূণদের আক্রমণ, রাজ্যবিস্তার সেই সাথে তাদের এদেশের অধিবাসী হয়ে যাওয়ার পিছনে যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। এদেরই আক্রমণের ফলে ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন যে ত্বরান্বিত

হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের যুগে সাম্রাজ্যের সব শক্তিই প্রায় বহিরাগত হূণ আক্রমণ ঠেকানর কাজে নিযুক্ত ছিল। ক্রমাগত হূণ আক্রমণ ঠেকানর জন্য স্থানীয় শক্তিগুলির এক জোট বাঁধার প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে এ সময়ে বেশ ক'টি শক্তিশালী রাজ্যের উৎপত্তির কথাও শোনা যায়। হূণদের সাথে ভারতে বহু উপজাতি ও নানা ধরনের লোক এসেছিল। এদের মধ্যে কিছু অংশ উত্তর ভারতে থেকে যায়, আবার কিছু অংশ দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে গুর্জরদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে গুর্জররা রাজপুতানায় ভিন্‌মাল, সিরোহী, ও নর্মদার মোহনায় ভৃগুকচ্ছে (বরোচ) রাজ্য স্থাপন করে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রতিহার বংশীয়দের এদেরই এক শাখা বলে মনে করা হয়। অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা যে রাজপুতরা এই হূণ, গুর্জর প্রভৃতি জাতি থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয় পাঠ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন

স্কন্দগুপ্ত (আঃ ৪৫৫-৬৭ খ্রীঃ) মারা যাওয়ার পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন সুরু হয়। হূণদের আক্রমণ প্রতিহত করলেও তাঁর আমল থেকেই সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সুরু হয়। স্কন্দগুপ্তের পর পুরগুপ্ত ও দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু এদের রাজত্ব বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। খোদাই করা লিপি ও অনুশাসন প্রভৃতি থেকে জানা যায় যে ৪৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বুধগুপ্ত সম্রাট হন এবং তাঁর রাজত্বকাল পর্য্যন্ত (৪৯৫ খ্রীঃ) পশ্চিমের কিছু অংশ ছাড়া সাম্রাজ্য প্রায় ঠিকই ছিল। বুধগুপ্তের পর হূণরা তোরমান ও মিহিরকুলের নেতৃত্বে ভারতের অভ্যন্তরে পূর্ব মালব অঞ্চল পর্য্যন্ত নিজেদের অধিকার বিস্তার করে। গুপ্তবংশের বালাদিত্য বা ভানুগুপ্ত নামে এক রাজার সাথে হূণদের যুদ্ধের কথা জানা যায়। হূণদের হারিয়ে যশোধর্মন মালব অঞ্চলে নিজের আধিপত্য স্থাপন করেন। তবে এর পরও গুপ্ত রাজাদের কথা জানা যায়। ৫৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উত্তরবঙ্গে গুপ্তরাজারা যে রাজত্ব

করতেন তার প্রমাণ আছে। বুধগুপ্তের পর বালাদিত্য বা ভানুগুপ্ত ছাড়া যে সকল গুপ্ত রাজাদের নাম পাওয়া যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নরসিংহগুপ্ত, তৃতীয় কুমারগুপ্ত, বিষ্ণুগুপ্ত ইত্যাদি। বিষ্ণুগুপ্ত সম্ভবত ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন বলে শোনা যায়। আবার মগধ ও মালব অঞ্চলে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিক পর্য্যন্ত গুপ্ত রাজাদের কথা শোনা যায়। ইতিহাসে
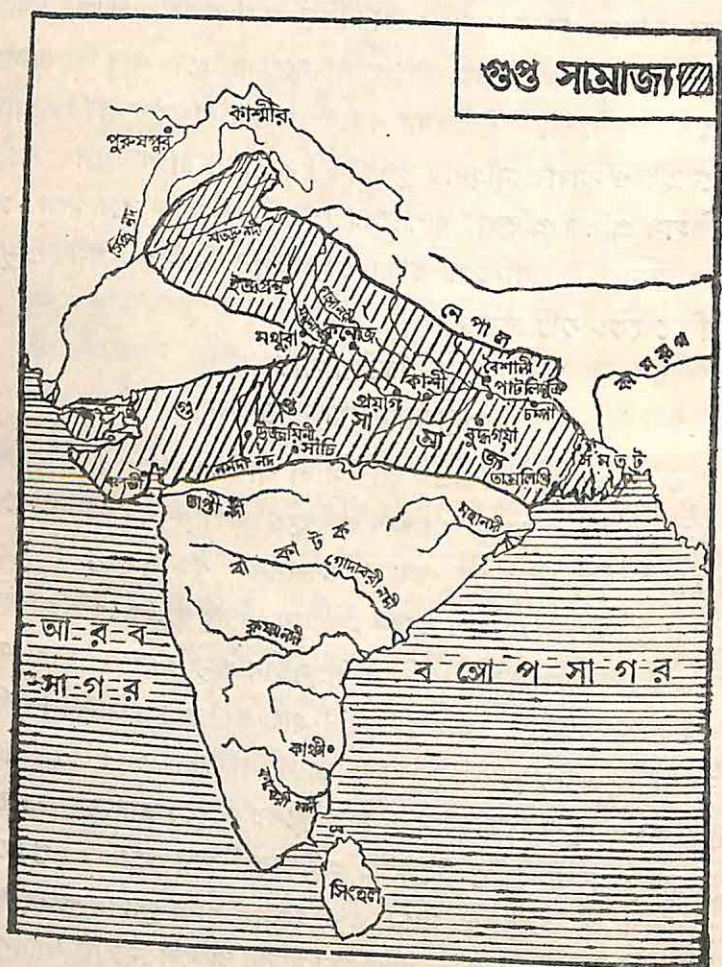
এরা পরবর্তী গুপ্ত রাজা নামে পরিচিত। সপ্তম শতাব্দীর শেষদিকে এই বংশের আদিত্য-সেন নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলিকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত। আভ্যন্তরীণ কারণ হিসাবে প্রথমেই দেখা যায় যে স্কন্দগুপ্তের পর রাজপরিবারে বিবাদ প্রভৃতির ফলে শাসন ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা ও সামন্তরাজারা স্বাধীন হতে সুরু করে ও কেন্দ্রীয় সরকার শক্তিহীন হয়ে পড়ে। প্রথম দিকের গুপ্তরাজারা হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী রাজারা বৌদ্ধধর্মের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হন ও সাম্রাজ্যের সামরিক ব্যবস্থার প্রতি তেমন মনোযোগ দেন নাই। এই প্রথম কারণের ফল হিসাবেই স্কন্দগুপ্তের পর হূণ জাতির বারবার আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা গুপ্তরাজগণ হারিয়ে ফেলে। ইতিপূর্বে কুমারগুপ্তের আমলে পুষ্যমিত্র জাতির আক্রমণেও গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

তৃতীয় পাঠ

হর্ষবর্ধন ঃ 'সকল উত্তরাপথনাথ'

গুপ্ত সম্রাটরা সাম্রাজের সৃষ্টি করে উত্তর ভারতে যে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করেছিলেন তা এই সাম্রাজের পতনের সাথেই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এ সময় পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব ভারতে যে ক'টি রাজ্য বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠে তাদের মধ্যে কনৌজ, থানেশ্বর, মালব, গৌড় ও কামরূপের নাম করা যায়। কনৌজের মৌখরী, থানেশ্বরের-পুষ্যভূতি ও মালবের যশোবর্মন হূণ আক্রমণ প্রতিহত করে ছিলেন। হূণদের শক্তি নষ্ট হওয়ার পর এ রাজ্যগুলির মধ্যে প্রাধান্য বিস্তারের প্রশ্ন নিয়ে ঝগড়া সুরু হয়।

থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের চতুর্থ রাজা প্রভাকরবর্ধনের মেয়ে রাজ্যশ্রীর সাথে কনৌজের মৌখরীরাজ গ্রহবর্মার বিয়ে হয়। ফলে এ দুই রাজবংশের মিত্রতা হয়। আনুমানিক ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রভাকরবর্ধন মারা যান ও তার বড় ছেলে রাজ্যবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসন লাভ করেন। থানেশ্বর ও কনৌজের জোটগঠনে উত্তরে মালব ও গৌড় একযোগ হয়। এ দুই রাজ্যের রাজারা একত্রে গ্রহবর্মাকে যুদ্ধে নিহত ও রাজ্যশ্রীকে

বন্দী করে। রাজ্যবর্ধন মালবরাজ দেবগুপ্তকে পরাজিত করেন, কিন্তু তিনি গৌড়রাজ শশাঙ্কের হাতে নিহত হন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর ছোট ভাই হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসন পান (আঃ ৬০৬ খ্রীঃ)। সিংহাসন পাওয়ার পরই হর্ষ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন ও রাজ্যশ্রীকে মুক্ত করেন। রাজ্যশ্রীকে উদ্ধারের পরই হর্ষ কনৌজের সিংহাসন লাভ করেন; কারণ গ্রহবর্মণ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। এই সময়ের পর থেকেই হর্ষ অবিরাম যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা এক সাম্রাজ্য গঠনে মন দেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মার সাথে বন্ধুত্ব করেন ও শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সুরু করেন। এ যুদ্ধ কতকাল স্থায়ী হয়েছিল বা এর ফলাফল কি হয়েছিল বলা মুস্কিল। তবে শশাঙ্ক যে অন্তত ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা হিসাবে রাজত্ব করেছিলেন তার প্রমাণ আছে। সাধারণত এরূপ মনে করা হয় যে ৬১৯ থেকে ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শশাঙ্ক মারা যান। হিউয়েন্-সাঙের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে মৃত্যুর আগে পর্য্যন্ত শশাঙ্ক মগধে রাজত্ব করতেন। তবে ৬১২ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষ সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এর দ্বারা এরূপ মনে করা হয় যে শশাঙ্ককে হারাতে না পারলেও হর্ষ সম্রাট উপাধি গ্রহণ করবার আগে অনেক রাজ্য জয় করেছিলেন। নর্মদা পার হয়ে হর্ষ দাক্ষিণাত্যের চালুক্য রাজ্য আক্রমণ করলে তিনি চালুক্য রাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে হেরে যান। ফলে হর্ষ দক্ষিণ ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পারেন নি। দ্বিতীয় পুলকেশী অবশ্য তাঁকে 'সকল উত্তরাপথনাথ' হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। এ থেকেই জানা যায় যে গুপ্ত আমলের সাম্রাজ্যের আদর্শ হর্ষের আমলে উত্তর ভারতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সাধারণত এরূপ মনে করা হয় যে হর্ষ পূর্ব পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মগধ, কঙ্গোদ, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চল

হর্ষবর্ধন

নিয়ে উত্তর ভারতেই এক সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর আমলে প্রসিদ্ধ চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন্‌সাঙ্‌ ভারতে আসেন। দীর্ঘ ৪০ বছর (আঃ ৬০৬-৬৪৬ খ্রীঃ) রাজত্ব করার পর হর্ষ মারা যান। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাম্রাজ্যও নষ্ট হয়ে যায়।

চতুর্থ পাঠ

হিউয়েন্‌সাঙ্‌ : ভ্রমণ : বিবরণ

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে ফাহিয়েনের মত হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে হিউয়েন্‌সাঙ্‌ নামে এক চীনা বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী এদেশে আসেন। তিনি চৌদ্দ বছর এদেশে ছিলেন। এযুগে চীন থেকে ভারতে আসা ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। মাত্র ২৯ বছর বয়সে (৬২৯ খ্রীঃ) বুদ্ধের পুণ্যভূমি দর্শন ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য তিনি এরূপ কাজে ব্রতী হন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও পণ্ডিত হিসাবে অবশ্য ভারতে আসার আগেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। চীনের পশ্চিম অঞ্চল থেকে 'উত্তরের রাস্তা' ধরে প্রায় তিন হাজার মাইল পথে ইসুক্‌কুল হ্রদ, তাসখন্দ, সমরখন্দ, কান্দাজ পার হয়ে তিনি কাবুলে পৌঁছান। ভারতের প্রায় প্রতি অঞ্চলেই তিনি ভ্রমণ করেন ও এদেশে চোদ্দ বছর কাটান। ফিরে যাওয়ার সময় তিনি আগের রাস্তা দিয়ে না গিয়ে 'দক্ষিণের রাস্তা' ধরেন ও পামীর পার হয়ে কাশগড়, ইয়ারখন্দ্‌ খোটান্‌ লপনর্‌ হয়ে নিজ বাসভূমিতে পৌঁছান। এদেশ থেকে চীনে তিনি বৌদ্ধধর্মের বই, পাণ্ডুলিপি নিয়ে যান ও সেগুলি চীনা ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। এ কাজেই তিনি জীবনের বাকী দিনগুলি কাটিয়ে দেন। তাঁর এই অপূর্ব নিষ্ঠা অধ্যবসায় প্রভৃতির জন্য চীনা সম্রাট ও জনগণের কাছ থেকে তিনি প্রভূত শ্রদ্ধা পান।

ভারত সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা তিনি লিখে রেখে যান। তাঁর এই বিবরণ সে যুগের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এক অমূল্য সম্পদ।

হিউয়েন্‌সাঙ্‌ ভারতীয়দের নৈতিক চরিত্রের যথেষ্ট প্রসংসা করেছেন। তিনি ভারতীয়দের সৎ, মিষ্টভাষী বলে উল্লেখ করেছেন।

এ যুগে হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা কঠোর ছিল ও অন্য জাতিতে বিয়ে নিন্দনীয় ছিল। ব্রাহ্মণরা পূজাপাঠ, ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধবিগ্রহ ও বৈশ্যরা ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে থাকত। তাঁর আমলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব তত বেশী ছিল না।

হিউয়েন্‌সাঙের বর্ণনা থেকে হর্ষের রাজসভা ও রাজ্যশাসন ব্যবস্থার যথেষ্ট খবর পাওয়া যায়। সম্রাট নিজে রাজ্যের চারিদিকে ঘোরাঘুরি করে ব্যক্তিগত ভাবে অনেক কিছু দেখাশোনা করতেন। উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে দিতে হত। হর্ষের আমলে দেশের দণ্ডবিধি খুব কঠোর ছিল। এ যুগে নালন্দা ও তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিল। হিউয়েন্‌সাঙ্ নিজেই নালন্দায় কয়েক বছর বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধে পড়াশোনা করেছিলেন।

পঞ্চম পাঠ
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

হর্ষের আমলে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। দেশ বিদেশ থেকে বহু শিক্ষার্থী এখানে শিক্ষা লাভ করতে আসত।
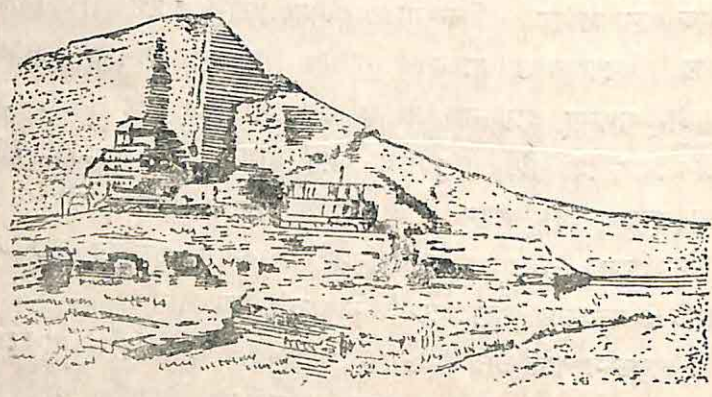
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ

এ সময়ে নালন্দার ছাত্র সংখ্যা ছিল দশ হাজার। বহু খ্যাতনামা অধ্যাপক এখানে অধ্যাপনা করতেন। ঠিক কোন সময়ে এ বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় তা বলা মুস্কিল। প্রধানত বৌদ্ধশাস্ত্রের শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবেই নালন্দার বিশ্বখ্যাতি ছিল। হিউয়েন্‌সাঙ্‌ নিজে এখানে কিছু সময় বৌদ্ধ শাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করেন। তবে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র ছাড়াও এখানে অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ন, আয়ুর্বেদ, সাহিত্য বিষয়ে পড়াশোনার ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক ছাত্রকেই পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্ত্তির সুযোগ দেওয়া হত। ছাত্রদের থাকার জন্য বৃহৎ ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা ছিল। তাদের থাকা, খাওয়া ও শিক্ষার জন্য কোন অর্থ দিতে হত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত খরচই রাজা ও দেশের লোকেরাই বহন করত। হর্ষের আমলে বাঙ্গালী পণ্ডিত শীলভদ্র ছিলেন নালন্দার অধ্যক্ষ। ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য এখানে বিরাট এক পাঠাগার ছিল। পাটনা জেলার বড়গাঁও গ্রামে নালন্দার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। হিউয়েন্‌সাঙের বিবরণে নালন্দার যথেষ্ট সংবাদ পাওয়া যায়। মুসলমান আক্রমণের সময় পর্য্যন্ত নালন্দার গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল।

(খ) হর্ষের পরবর্তীকাল

(অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী)

ষষ্ঠ পাঠ

সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ঃ ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি

৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ বা ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে হর্ষ মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পরই উত্তর ভারতে তিনি যে সাম্রাজ্য তৈরী করেছিলেন তা ভেঙ্গে যায়। এর কারণ হল হর্ষের পর তাঁর সিংহাসনে যোগ্য শাসকের অভাব। এ সময় থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে অর্থাৎ মুসলমান আক্রমণের আগে পর্য্যন্ত উত্তর ভারতে অনেক ছোট ছোট রাজ্যের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব দেখা যায়। এসব হিন্দু রাজ্যগুলির মধ্যে প্রাধান্যের প্রশ্ন নিয়ে বিবাদ লেগেই থাকত। তবে এই সাড়ে পাঁচশ বছরে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস বলতে শুধুমাত্র এই রাজ্যগুলির যুদ্ধের ইতিহাস বললেই ভুল হবে। এই সকল ছোট ছোট রাজ্যেও রাজসভা, সভাকবি, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের প্রসার ও জনকল্যাণমূলক কাজ

অব্যাহতই ছিল। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের এসব ছোট ছোট রাজ্যগুলি নিজেদের অভ্যন্তরীণ কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকত। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি থেকেও মাঝে মাঝে উত্তর ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলত। সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে শাসন ব্যবস্থার ধরন ধারণও নষ্ট হয়ে যায়। ফলে এসব ছোট ছোট রাজ্যগুলিতে রাজারা নিজেদের পছন্দমত শাসন ব্যবস্থা চালু রাখতেন। আর রাজ্যগুলির ভিতরেও ক্ষমতা নিয়ে রাজ পরিবারের মধ্যে নানা গৃহবিবাদ থাকাও আশ্চর্য্য ছিল না। ফলে এ যুগে নূতন কোন রাজনৈতিক ভাবধারা যেমন শাসন ব্যবস্থায় প্রজাতন্ত্র অথবা কোন স্বাধীন শহর প্রভৃতির সৃষ্টি দেখাই যায় না। রাজারা নিজেদের খেয়ালখুশীমত রাজত্ব করতেন। তবে তাদের ধর্ম ও ব্রাহ্মণরা এই স্বেচ্ছাচারী রাজাদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতেন।

এ যুগে অপেক্ষাকৃত বড় শক্তি বা রাজ্য বলতে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে গুর্জর প্রতিহারদের রাজ্য, বাংলার পাল বংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ দুই শক্তি ছাড়া আর যে সকল রাজ্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন সেগুলি হল নেপাল, কামরূপ (আসাম), কাশ্মীর, উৎকল (উড়িষ্যা), সৌরাষ্ট্রের শোলাঙ্কী বা চালুক্য বংশ, সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলে ভাতিন্দার জাঠ বংশ, বুন্দেলখণ্ডের চান্দের বংশ ইত্যাদি। এছাড়া হিমালয়ের পাদদেশে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ছোট রাজ্যের অস্তিত্ব দেখা যায়, যেমন চম্পক (চাম্বা), কুমায়ুন, দুর্গারা (জম্মু), ত্রিগার্তা (জলন্ধর), কুলুতা (কুলু) গহ্ড়বাল বংশ ইত্যাদি।

সপ্তম শতাব্দীতে কাশ্মীর রাজ্যের প্রভাব ও প্রতিপত্তির কথাও জানা যায়। পাঞ্জাবের কিছু অংশও এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে আরবদেশের মুসলমানদের বাধা দেওয়ার জন্য কাশ্মীরের রাজা চীনের সাহায্য চেয়েছিলেন শোনা যায়। এ শতাব্দীতেই কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের সেনাবাহিনী গাঙ্গেয় উপত্যকায় অধিকার বিস্তার করে ও পাঞ্জাব থেকে আরবদের হটিয়ে দেয়।

এ সময়েই নেপালের প্রভাব প্রতিপত্তির কথাও শোনা যায়। ৮৭৮

খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতের আধিপত্য থেকে নেপাল নিজেকে মুক্ত করে স্বাধীন হয়।

নবম শতাব্দীতে কাবুল ও গান্ধার অঞ্চলে শাহী নামে এক তুর্কী রাজবংশ রাজত্ব করত। এ রাজ্যে এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী পরে ক্ষমতা দখল করে নেন ও তিনি যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন তা হিন্দু শাহী রাজবংশ নামে পরিচিত। এই বংশের রাজা জয়পালের সাথে গজনীর সুলতান মামুদের যুদ্ধ হয় (১০০১ খ্রীঃ)। জয়পাল পরাজিত হন ও এই অপমানে তিনি আত্মহত্যা করেন।

সপ্তম পাঠ

রাজপুত জাতি ঃ পরিচয় ঃ উত্থান

রাজপুতদের উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ আছে। আজকালকার ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে হূণ, গুর্জর প্রভৃতি জাতিদের সাথে রাজস্থানের স্থানীয় অধিবাসীদের সংমিশ্রণেই রাজপুত জাতির উদ্ভব। আবার অনেকের ধারণা এরা সূর্য বংশীয় বা চন্দ্র বংশীয় ভারতীয় ক্ষত্রিয়। রাজপুতদের অনেক শাখা রামায়ণ ও মহাভারতের বীর পুরুষদের বংশধর বলে দাবী করে থাকেন। অনেক ঐতিহাসিক আবার এদের মূল ভারতীয় বলেই মনে করেন। রাজনৈতিক দিক থেকে রাজপুতরা সাধারণত নবম ও দশম শতাব্দীতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। এ সময়ে এরা বেশ কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে চারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা হল প্রতিহার বা পরিহার, চৌহান, শোলাঙ্কী (চৌলুক্য) ও পারমার বংশ। এই চার গোষ্ঠী নিজেদের অগ্নিকুলোদ্ভব বলে দাবী করেন। এ ব্যাপারে এদের যুক্তি হল রাজস্থানের কোন অঞ্চলে এক যজ্ঞাগ্নি থেকে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় এবং তিনিই এই চার গোষ্ঠীর আদি পুরুষ। রাজপুতদের এই চার গোষ্ঠীই প্রথম দিকে প্রায় সমস্ত রাজপুতদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করত। প্রতিহাররা প্রথম দিকে যে বিরাট রাজ্য তৈরী

করেছিল সে রাজোর স্থলেই এরা ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্টি করে। চৌহানরা প্রথম দিকে সামন্ত রাজা হিসাবে শাসন শুরু করে ও পরে স্বাধীন হয়। এদের রাজ্য ছিল দিল্লীর দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল। সোলাঙ্কীরা কাথিয়াওয়াড় অঞ্চলে রাজ্য তৈরী করে আর এ বংশের শাখা প্রশাখা মালব, চেদী, পাটান, ব্রোচ প্রভৃতি অঞ্চলে রাজ্য সৃষ্টি করে। দশম শতাব্দীর শেষদিকে সোলাঙ্কীরা তাদের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। পারমার (পাবার) গোষ্ঠী মালবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। ইন্দোরের কাছে ধার নামে জায়গায় ছিল এদের রাজধানী। রাষ্ট্রকূটদের সাথে এদের আত্মীয়তার যোগ ছিল বলে মনে করা হয়। এছাড়াও অগ্নিকুলোদ্ভব আরও যেসব রাজপুত বংশের নাম পাওয়া যায় তারা হল খাজুরোহা অঞ্চলের চন্দেলবংশ ও মেবারের গুহিলা বংশ। আরবদের আক্রমণ ভীতি রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহারদের দুর্বলতাকে প্রকট করে তোলে। ফলে তাদের অধীনস্থ ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে অনেক রাজপুত সামন্তরাজা স্বাধীন হয়ে যায়। চৌহানদের প্রতিবেশী তোমার নামে আর এক রাজপুতবংশ দিল্লীর কাছে হারিয়ানা অঞ্চলে রাজত্ব করত। ৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এরাই দিল্লী শহরের পত্তন করে। দ্বাদশ শতাব্দীতে চৌহানরা এদের উৎখাত করে দিল্লী দখল করে। কালচুরী নামে রাজপুতদের আর এক বংশ জব্বলপুর অঞ্চলে এক রাজ্য গড়ে তোলে। ত্রিপুরা ছিল এদের রাজধানী। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষদিকে চন্দ্রদেব নামে এক ব্যক্তি গাহড়্বাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কাশী ও কনৌজ দখল করেন। তাঁর পৌত্র গোবিন্দ চন্দ্রের আমলে মুঙ্গের পর্য্যন্ত এদের রাজ্য বিস্তৃত হয়। গোবিন্দচন্দ্রের পৌত্র জয়চন্দ্রই এই বংশের শেষ ও শক্তিশালী রাজা। দিল্লী ও আজমীরের চৌহানরাজ তৃতীয় পৃথ্বীরাজের সাথে তার শত্রুতা হয়। শোনা যায় জয়চন্দ্রই মুহম্মদঘুরীকে পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেন। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পর মুহম্মদঘুরী জয়চন্দ্রকে চন্দ্রবার নামে এক জায়গায় পরাজিত ও নিহত করেন (১১৯৪)। ফলে দিল্লীর সাথে গাহড়্বাল রাজ্যও মুসলমানদের অধিকারে আসে।

অষ্টম পাঠ

পাল-প্রতিহার-রাষ্ট্রকূট দ্বন্দ্ব

হর্ষের মৃত্যুর পর তাহার সাম্রাজ্য নষ্ট হয়। তবে কনৌজের অধিকার ও তার সাথে সাম্রাজ্যের পুনঃস্থাপনের যে চেষ্টা ছিলনা তা নয়। এ ব্যাপারে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের প্রতিহার ও পাল রাজবংশ ছাড়া নাসিক অঞ্চলের রাষ্ট্রকূট শক্তিরও কনৌজ অধিকার করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। রাষ্ট্রকূট শক্তিকে সাধারণত দাক্ষিণাত্যের শক্তি হিসাবেই দেখা হয়। তবে ঐতিহাসিকরা একে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সংযোগকারী রাষ্ট্র হিসাবেই বর্ণনা করেছেন। অবশ্য উত্তর ভারতে এদের সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা থেকেই এরূপ আখ্যা দেওয়া কোন ক্রমেই ভুল নয়। ৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গ চালুক্যদের হারিয়ে নাসিক অঞ্চলে রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি কাঞ্চী, মালব ও গুজরাট জয় করে দাক্ষিণাত্যে নিজবংশের আধিপত্য স্থুরু করেন। এই বংশের তৃতীয় গোবিন্দকেই (৭৯৩-৮১৪) সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি হিসাবে গণ্য করা হয়।

কনৌজকে কেন্দ্র করে এ যুগে রাষ্ট্রকূট, পাল ও প্রতিহারদের মধ্যে বিবাদ স্থুরু হয়। হর্ষের সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসাবে কনৌজের অধিকার মর্যাদার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ফলে এই তিন শক্তির সমস্ত সামরিক প্রস্তুতি কনৌজ দখলের ব্যাপারে নিঃশেষিত হয়ে পড়ে। আর সেই স্থযোগে সামন্তরা ও ছোট ছোট রাজারা নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে সাহস পায়। প্রতিহারদের কথা ইতিপূর্বে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। পশ্চিম ভারতে রাজস্থানে গুর্জরদের থেকেই এদের উৎপত্তি। রাষ্ট্রকূটরা শত্রুতা বশতই মনে হয় এদের দাররক্ষী আখ্যা দেয়। মালবের প্রতিহার রাজ প্রথম নাগভট্ট সিন্ধুজয়ী আরবদের হারিয়ে দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। আরবদের হারিয়ে প্রতিহাররা ভারতের পূর্বদিকে রাজ্যবিস্তারে মন দেয় ও অষ্টম শতাব্দীর শেষদিকে এরা রাজস্থানের বিরাট অঞ্চল ও মালবে উজ্জয়নী ছাড়াও কনৌজ দখল

করতে সমর্থ হয়। তবে ৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটদের আক্রমণে কনৌজে প্রতিহার সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়।

রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহাররা ছাড়া কনৌজ দখল করার ব্যাপারে এ যুগে আরও এক শক্তি হল বাংলার পাল বংশ। অষ্টম শতাব্দীতে রাজা গোপালের আগে পালবংশের পরিচয় সঠিক জানা যায় না। গোপাল বাংলাদেশে পালবংশের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু এ বংশের ধর্মপালের আমলেই উত্তর ভারতে এক শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে পালরা নিজেদের পরিচয় দেয়। রাষ্ট্রকূটদের কাছে ধর্মপাল হেরে গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর আমলে পূর্বভারতে পালরাই সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল। অষ্টম শতাব্দীর শেষে ধর্মপাল কনৌজ অভিযান করেন ও প্রতিহারদের আশ্রিতকে কনৌজের সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করে নিজের প্রাধান্য স্থাপন করেন। এর পর কনৌজ পুনরায় রাষ্ট্রকূটদের হস্তগত হয়। ফলে প্রতিহাররা কনৌজ পুনর্দখল করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এভাবে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই তিন শক্তিরই কনৌজ দখল ও অধিকারে রাখা এক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। দশম শতাব্দীতে (৯১৬) রাষ্ট্রকূটরা শেষবারের মত কনৌজ দখল করে। তবে কনৌজকে নিয়ে রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহাররা ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহে নিজেদের শক্তি প্রায় নিঃশেষ করে ফেলে। দশম শতাব্দীর প্রথমদিকে আরবদেশীয় ভ্রমণকারী অল্ মাসুদী কনৌজে আসেন ও তার বর্ণনা থেকে কনৌজের অবস্থা জানা যায়। এর এক'শ বছর পর প্রতিহাররা আর উত্তর ভারতে কোন শক্তি হিসাবেই গণ্য হত না। ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী বাহিনী কনৌজ লুণ্ঠন করে। এর ফলেই কনৌজে প্রতিহারদের শাসনও শেষ হয়। অন্যদিকে আবার পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে চালুক্যদের হাতে রাষ্ট্রকূট শক্তিও শেষ হয়ে যায়।

(গ) বাংলাদেশ

নবম পাঠ

শশাঙ্ক (আঃ ৬০৬-৬৩৭ খ্রীঃ)

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্তরাজাদের ক্ষমতা বলতে যখন কিছুই ছিলনা সে সময় গৌড় (উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ) স্বাধীন হয়। এ শতাব্দীর শেষদিকে গৌড় রাজারা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ও উড়িষ্যার কিছু অংশে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। এ সময়ে গৌড়ের পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন গোপচন্দ্র।

সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্ক নামে গৌড়ের এক সামন্ত সিংহাসন দখল করেন। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটির কাছে রাজবাড়ীডাঙ্গা নামে যে জায়গা আছে সেখানেই শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত ছিল। মগধ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। হর্ষবর্ধন ও পুলকেশীর মত তিনিও এক সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম গৌড় বা বাংলাদেশকে সে যুগের ভারতে এক প্রথম শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত করেন। এ কারণেই বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে শশাঙ্কের সময়কে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়। কনৌজের মৌখরী বংশের সাম্রাজ্য স্পৃহা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য শশাঙ্ক মালব রাজ দেবগুপ্তর সাথে এক জোট তৈরী করেন। ইতিপূর্বে মৌখরীরাজ গ্রহবর্মা থানেশ্বরের পুষ্যভূতিবংশের প্রভাকর বর্ধনের কন্যা রাজশ্রীকে বিয়ে করে এই দুই বংশের সদ্ভাব স্থাপন করেছিলেন। গ্রহবর্মা মালবরাজ দেবগুপ্তর সাথে যুদ্ধে মারা যান। রাজ্যবর্ধন এর প্রতিশোধ নিতে গেলে শশাঙ্ক তাকে যুদ্ধে নিহত করেন। রাজ্যবর্ধনের ভাই হর্ষবর্ধন থানেশ্বর ও কনৌজ এই দু'জায়গার সিংহাসন পান, কারণ গ্রহবর্মার কোনও সন্তান ছিল না। হর্ষবর্ধন শাসনক্ষমতা পাবার পর থেকেই কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মার সাথে বন্ধুত্ব করে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ সুরু করেন। হর্ষ অবশ্য শশাঙ্কের জীবিতকালে তাঁর বিরুদ্ধে খুব একটা সাফল্য লাভ করতে পারেন নাই। অন্তত ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যান্ত শশাঙ্ক

যে স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করেছিলেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া গেছে। ঐ বছরের এক শিলালিপি থেকে একথা জানা যায়, আর এই শিলালিপিতে আরও জানা যায় যে দক্ষিণে গঞ্জাম জেলা পর্য্যন্ত তার অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল। ৬১৯ থেকে ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া হয়। তাঁর মৃত্যুর পর কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা ঐ রাজ্য দখল করে নেন। হিউয়েন্‌সাঙের বর্ণনায় শশাঙ্ককে যেরূপে বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী বলা হয়েছে তা ঠিক নয়। এর কারণ হল শশাঙ্ক নিজে শৈব ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর রাজধানীতে বৌদ্ধবিহারের অবস্থিতি তাঁর পরধর্মসহিষ্ণুতারই পরিচয় দেয়।

দশম পাঠ

পাল ও সেন যুগে বাংলার সমাজ ও জীবনযাত্রা

বাংলাদেশের ইতিহাসে পাল ও সেন বংশের শাসন এক গৌরবময় যুগ। সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাল ও সেন যুগে এক বিশেষ অগ্রগতি ও সাফল্যের চিহ্ন দেখা যায়। পাল আমলেই আজকের বাঙ্গালী জাতির ও তাঁর সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হয়। হর্ষের পর পালরা উত্তর ভারতের এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল।

আর্যদের সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী পাল ও সেন যুগের সমাজ ব্যবস্থাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি প্রধান শ্রেণী বা বর্ণ ছিল। এই বর্ণ ও শ্রেণীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, গন্ধবণিক, তন্তুবায়, মালাকার, মোদক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির কথা শোনা যায়। এ সময় থেকে সমাজে ব্রাহ্মণ ছাড়াও কায়স্থ ও বৈশ্যদের প্রাধান্য সুরু হয়। বল্লাল সেন (আঃ ১১৫৮-১১৭৯ খ্রীঃ) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথা চালু করে বাংলার হিন্দু সমাজকে নূতন রূপ দেন। এ যুগে নারীদের শিক্ষার প্রচলন ছিল, তবে তাদের স্বাধীনতা ছিলনা। পুরুষদের একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করার অধিকার ও কৌলিন্য প্রথা

চালু থাকার ফলে পারিবারিক জীবনে অশান্তি দেখা দিত। বিধবা বিবাহ অপরাধ বলে গণ্য করা হত। জীমূতবাহন রচিত 'দায়ভাগ' গ্রন্থে বাঙ্গালী বিধবাদের স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকারের কথা দেখা যায়। বাংলাদেশের বাইরে অবশ্য এরূপ অধিকারের কথা শোনা যায় না।

এ যুগের অধিকাংশ লোকই ছিল গ্রামবাসী, আর এদের উপজীবিকা ছিল কৃষি। আজকালকার মত তখনও ধানই ছিল প্রধান উৎপন্ন খাদ্যশস্য, আর চাষের ব্যবস্থা প্রায় আজকালকার মতই ছিল। ধান ছাড়া আখ, কাপাস ইত্যাদির চাষ হত। বাংলার তাঁত শিল্পের এ যুগে বেশ সুনাম ছিল। পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারেও মোটামুটি আজকালকার মত ধুতি ও শাড়ির চলন ছিল। আর দামী গহণাপত্রও আজকালকার মত ধনীদের মধ্যেই চলন ছিল। খেলাধূলার ব্যাপারে অবশ্য আজকালকার যুগের সাথে সে যুগের যথেষ্ট অমিলই আছে বলা যায়। কারণ ঐ যুগের মল্লযুদ্ধ, বাইচ, শিকার আজকাল ঠিক চলন নেই, তবে সেকালের পাশা, দাবা, নাচ, গান, অভিনয় এযুগে এখনও টিকে আছে। অনুষ্ঠানাদির মধ্যে অন্নপ্রাশন, বিয়ে, শ্রাদ্ধ, দুর্গাপূজা, কালীপূজা, মনসাপূজা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, হোলি, জন্মাষ্টমী ঐ যুগেও প্রচলিত ছিল।

যানবাহনের ব্যাপারে সে যুগে স্থলপথে গরুরগাড়ী ও জলপথে নৌকাই ছিল প্রধান মাধ্যম।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পাল ও সেন যুগে বাংলাদেশের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। পুরানো নগরগুলি ছিল বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। দেশের ভিতরে ব্যবসাবাণিজ্যের মত স্থল ও জলপথে বাহিরের দেশের সাথেও বাণিজ্যিক লেনদেন চলত। তাম্রলিপ্ত, শ্রীপুর, সপ্তগ্রাম সে যুগের উল্লেখযোগ্য বন্দর। সমুদ্রপথে এই বন্দরগুলি সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চম্পা, কম্বোজ, যবদ্বীপ, চীন, আর স্থলপথে তিব্বত, নেপাল, ভূটান প্রভৃতি দেশের সাথে বাংলার বাণিজ্যিক আদান প্রদান হত। বাংলার মসলিন বস্ত্র বহির্বাণিজ্যের রপ্তানী সামগ্রী ছিল।

পাল ও সেন আমলের আগে বাংলায় সোনা ও রূপার মুদ্রার চলন

ছিল। পাল যুগে তামার মুদ্রার প্রচলন দেখা যায়। সেন আমলে 'পুরাণ' ও 'কপর্দক-পুরাণ' নামে দু'রকমের মুদ্রা চালু ছিল।

একাদশ পাঠ
ধর্ম ও জ্ঞান চর্চা

হর্ষের মৃত্যুর পর ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমতে সুরু করে। বাংলার পাল রাজারা এই ধর্মের পুনরুজ্জীবন করেন। পাল রাজারা ছিলেন মহাযানী বৌদ্ধ, তবে এদের অনেকেই ব্রাহ্মণ পরিবারে বিয়ে করেছিলেন। ফলে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ধর্মের এ যুগে এক সমন্বয় ঘটে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হলেও পালরাজারা কিন্তু বৌদ্ধধর্ম প্রসারেই মন দেন। নালন্দা মহাবিহারে তারা অকুণ্ঠচিত্তে দান করতেন। বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির এই পৃথিবী বিখ্যাত পীঠস্থানের উন্নতির জন্য এদের দান কম ছিল না। পালযুগে ওদন্তপুরী, সোমপুরী, বিক্রমশীল মহাবিহার (বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠিত হয়। বিক্রমশীল মহাবিহারের সাথে বিখ্যাত পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নাম অমর হয়ে আছে।

সেন রাজাদের আমলে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পুনরুত্থাপন হয়, আর বৌদ্ধধর্মের প্রায় অবলুপ্তি ঘটে। এ যুগে আজকালকার মত হিন্দু দেবদেবীর পূজা সুরু হয় ও বহু মন্দির তৈরী হয়। সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুধর্ম ভারতের বাইরে যেমন তিব্বত, নেপাল, আরাকান প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তৃত হয়।

বাংলাদেশে পাল আমল সুরু হওয়ার আগে থেকেই সংস্কৃতের চর্চা সুরু হয়। পাল ও সেন আমলে সাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষা, দর্শন প্রভৃতি এই ভাষাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়। পাল আমলে অন্যান্য বিদ্যার সাথে বেদ, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, তর্ক, মীমাংসা, বেদান্ত, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, কাব্য প্রভৃতির চর্চা হত। 'রামচরিত' কাব্যের রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী, 'অম্বরসিদ্ধি' গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীধরভট্ট, 'নিদান'

গ্রন্থের রচয়িতা মাধব, 'দায়ভাগ' রচয়িতা জীমূতবাহন পালযুগে আবির্ভূত হন। পাল যুগের মত সেন যুগেও সংস্কৃত সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। সেন যুগকে সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। রাজা বল্লালসেন সংস্কৃত ভাষায় 'দানসাগর' ও 'অদ্ভূতসাগর' নামে দু'খানি গ্রন্থ লেখেন। হলায়ুধ, ধোয়ী, জয়দেব, উমাপতিধর, শরণ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ লক্ষণসেনের রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন। 'গীতগোবিন্দ' রচনা করে জয়দেব অমর হয়ে আছেন ; আর ধোয়ী কালিদাসের মেঘদূত অনুকরণে 'পবনদূত' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

(ঘ) দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস

দ্বাদশ পাঠ

চালুক্য (বাতাপি), কাঞ্চী ও চোল রাজ্য সমূহ

চালুক্য বংশ (বাতাপি) ঃ চালুক্য জাতির আদি পরিচয় সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা মুস্কিল। অনেকেই এদের গুর্জর জাতির এক শাখা বলে মনে করেন। কেহ কেহ আবার এদের দাক্ষিণাত্যের পুরাণ কানাড়ী বংশজাত বলে মনে করেন। দাক্ষিণাত্যে বাতাপী ও কল্যাণী এই দুই অঞ্চলে এদের দু'টি আলাদা রাষ্ট্রের কথা জানা যায়। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে (আঃ ৫৩৫ খ্রীঃ) বাতাপী (বর্তমান বিজাপুর জেলার বাতাপী) অঞ্চলে চালুক্যরা এক রাজ্য স্থাপন করে। প্রথম পুলকেশী (৫৩৫-৫৬৬ খ্রীঃ) ছিলেন এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। পাশাপাশি অঞ্চল জয় করে তিনি রাজ্য সীমা বাড়িয়ে নেন ও নিজের প্রাধান্য জাহির করবার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। দ্বিতীয় পুলকেশীকেই (আঃ ৬১০-৬৪২) এ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি মনে করা হয়। তিনি হর্ষের সমসাময়িক ছিলেন ও হর্ষ তাঁর কাছে পরাজিত হন। হিউয়েন্‌সাঙ্‌ তাঁর রাজ্যে এসেছিলেন। তিনি দ্বিতীয় পুলকেশীকে সমগ্র দাক্ষিণাপথের সম্রাট বলে বর্ণনা করেছেন। আইহোল লিপি থেকে তাঁর বিজয় কীর্তি জানা যায়। নর্মদা থেকে কাবেরী পর্য্যন্ত সব অঞ্চল যুদ্ধের দ্বারা তিনি নিজ

রাজ্যভুক্ত করেন, আর কাবেরীর দক্ষিণে চোল, চের, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্যগুলির উপর প্রাধান্য বিস্তার করেন। তিনি পারস্যের রাজা দ্বিতীয় খসরুর সাথে দূত বিনিময় করেন। তাঁর শেষ জীবন কিন্তু সুখের হয় নাই। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মার পুত্র প্রথম নরসিংহবর্মা দ্বিতীয় পুলকেশীকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে বাতাপী অধিকার করেন (৬৪২ খ্রীঃ)। ৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূট রাজ দন্তিদুর্গের কাছে বাতাপীর চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মনের পরাজয়ের সাথে বাতাপীর চালুক্য শক্তি নষ্ট হয়। এই বংশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল সিন্ধুদেশ জয়ী আরবরা এদের কাছে হেরে যান। ফলে দক্ষিণ-ভারতে মুসলমান অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়।

শিল্পের ক্ষেত্রে চালুক্য বংশের যথেষ্ট অবদান আছে। একারণে এ বংশকে গুপ্তদেরই উত্তরাধিকারী বলা হয়। অজন্তার গুহাচিত্রগুলি এ বংশের শ্রেষ্ঠ অবদান। প্রথম গুহার অনেকগুলি চিত্র চালুক্য আমলের প্রথম দিকেই আঁকা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রেও এ বংশের অবদান আছে। রাজধানী বাদামীর কাছে পাট্টাদাকালে ও আইহোলে এ শিল্পের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। বিরুপাক্ষের মন্দির ও সঙ্গমেশ্বর মন্দির এদের অপূর্ব কীর্ত্তি।

পল্লব বংশ ঃ দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন শক্তির পতনের পর কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে পল্লব নামে এক রাজশক্তির উত্থান হয়। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে শিবস্কন্দবর্মন নামে এ বংশের এক রাজার নাম পাওয়া যায়। তিনি কাঞ্চীতে এ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন ও অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা নিজ শক্তির পরিচয় দেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে এ বংশের বিষ্ণুগোপ গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের কাছে হেরে যান। এ বংশের মহেন্দ্রবর্মনের আমল (৬০০-৬৩০ খ্রীঃ) থেকে পল্লব-চালুক্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হয়। তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে হেরে যান ও বেঙ্গী প্রদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। বিদ্যানুরাগী হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। মহেন্দ্রবর্মনের পুত্র নরসিংহবর্মন এ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাঁর আমলে (৬৩০-৬৬৮) দক্ষিণ ভারতে পল্লব শক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়।

চালুক্যদের আক্রমণ প্রতিহত করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি। ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় পুলকেশীকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে পিতার অপমানের প্রতিশোধ নেন। তাঁর আমলে হিউয়েন্‌সাঙ্‌ তাঁর রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। তিনি ছিলেন শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর আমলে মহাবলীপুরমের প্যাগোডা বা রথ আকারের মন্দির তৈরী হয়েছিল। নরসিংহবর্মনের পর থেকে পল্লব শক্তির পতন সুরু হয়। অবশেষে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ দিকে চোলরাজ আদিত্যচোলের সাথে যুদ্ধে পল্লবরাজের পরাজয়ের ফলে পল্লবরাজ্য চোলদের হস্তগত হল (৮৯১ খ্রীঃ)। চোলরা প্রথমে পল্লবদেরই অধীন ছিল। কিন্তু কালক্রমে তারা শক্তিশালী হয় ও পল্লবদের রাজ্য জয় করে নেয়।

দক্ষিণ ভারতের মন্দির

পল্লব রাজারা শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাদের আমলে পাহাড়ের গা কেটে যে মন্দিরগুলি তৈরী করা হয়েছিল তা পল্লব যুগের এক অপূর্ব অবদান বলা যায়। প্রথম নরসিংহবর্মনের আমলে মহাবলীপুরম বা মামল্লপুরমে পাহাড় কেটে সাতটি মন্দির বা রথ তৈরী হয়। এগুলির মধ্যে দ্রৌপদী রথ দেখতে ঠিক বাংলাদেশের কুঁড়েঘরের মত। অর্জুন তপস্যা, গঙ্গাবতরণ, মহিষীমর্দিনী প্রভৃতি পাথরের চিত্রগুলি পল্লব শিল্পের এক অপূর্ব সৃষ্টি। এ ছাড়া এ যুগে বহু মন্দিরও তৈরী হয় যেগুলির কারুকার্য বিশেষ নৈপুণ্যের দাবী রাখে। শিল্পের মত সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও পল্লবদের দান কম ছিল না। পল্লবযুগে কাঞ্চী সংস্কৃতের পীঠস্থান
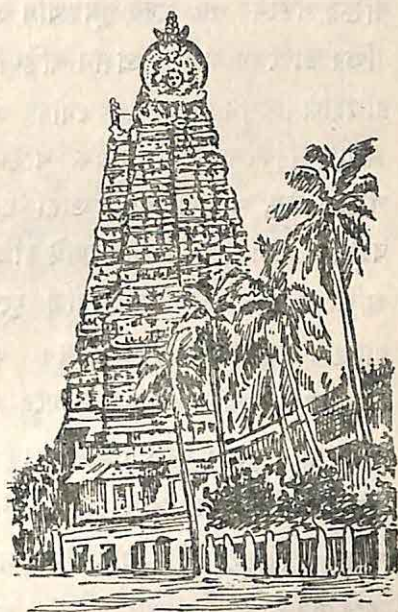
হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ভারবী এ যুগে খ্যাতি লাভ করেন। পল্লব রাজ মহেন্দ্রবর্মন নিজে সুসাহিত্যিক ছিলেন। তিনি 'মত্তবিলাস প্রহসন' নামে বিখ্যাত এক নাটক রচনা করেছিলেন।

চোলরাজ্য ঃ—এ যুগে সুদূর দক্ষিণের চোলরা অপর এক শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে পরিচয় দেয়। বর্তমান পেনার ও ভেলার নদীর মাঝখানে চোলদের আদি বাসস্থান ছিল। মহাভারত, মেগাস্থিনিসের বিবরণী ও অশোকের শিলালিপিতে এদের পরিচয় আছে। নবম শতাব্দীতে পল্লব শক্তির পতনের পর এদের পুনরুত্থান ঘটে ; আর দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রধান শক্তি হিসাবে এরা বিরাজ করে। মহামতি রাজরাজ ছিলেন চোলবংশের গৌরব ও প্রভাব প্রতিপত্তির প্রতিষ্ঠাতা। অন্যান্য দিক ছাড়া সামুদ্রিক শক্তি হিসাবে চোলরা এ যুগে নিজেদের পরিচয় দেয়, আর এর দ্বারা তারা রাজ্যজয় ও বহির্বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়। নৌবাহিনীর সাহায্যেই রাজরাজ (৯৮৫-১০১০ খ্রীঃ) সিংহল অভিযান করেন। সিংহলরাজ যুদ্ধে হেরে গিয়ে রাজরাজকে তাঁর রাজ্যের উত্তর অংশ ছেড়ে দেন। এ ছাড়া শক্তিশালী নৌবাহিনীর সাহায্যে রাজরাজ আরব সাগরে মালদ্বীপ জয় করে নিয়ে ছিলেন। রাজরাজের পুত্র প্রথম রাজেন্দ্রচোল (১০১১-৪৪) এ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তাঁর আমলেও চোলরা সামুদ্রিক শক্তি হিসাবে নিজেদের শক্তির পরিচয় দেয়। নৌবাহিনীর সাহায্যে তিনি দক্ষিণব্রহ্ম, মার্তাবান, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, মালয়, যবদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ বা সুমাত্রার কিছু অংশ জয় করেন। রাজ্যজয় ছাড়াও চোল আমলে সমুদ্রপথে বহির্বিশ্বের সাথে বাণিজ্যিক আদান প্রদানের কথা জানা যায়। সামুদ্রিক বাণিজ্যের ফলে চোল রাজ্য অসামান্য উন্নতি করেছিল এরূপ শোনা যায়। এই রাজ্যের বণিকদের বহু বাণিজ্যপোত ছিল ও এগুলি এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য করত। মহাবলীপুরম, কাভেরীপত্তিনম, সালিয়ুর, কারোকাই প্রভৃতি পূর্ব উপকূলে ও কুইলন, মালবার প্রভৃতি পশ্চিম উপকুলের বন্দরগুলি এ যুগে খ্যাতি লাভ করে।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions)

এক কথায় উত্তর দাও :—

১। হূণদের যে শাখা ভারত আক্রমণ করে তারা কি নামে পরিচিত ?

২। মিহিরকুলের পিতার নাম কি ?

৩। কোন্ গুপ্ত রাজার কাছে হূণরা হেরে যায় ?

৪। বিষ্ণুগুপ্ত কোন্ সময় পর্য্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন ?

৫। হর্ষবর্ধন কোন রাজবংশের লোক ছিলেন ?

৬। দাক্ষিণাত্যের কোন্ রাজার কাছে হর্ষ হেরে যান ?

৭। হিউয়েন-সাঙ্ কোন দেশের লোক ?

৮। শীলভদ্রের পরিচয় কি ?

৯। সুলতান মামুদ কোথাকার লোক ?

১০। শশাঙ্কের রাজধানীর নাম কি ছিল ?

১১। কোন্ মহাবিহারের সাথে পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্করের নাম অমর হয়ে আছে।

১২। চালুক্যদের কোন্ জাতির শাখা বলে মনে করা হয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answre Type)

১। কি কারণে স্কন্দগুপ্তের কাছে হেরে যাওয়ার পরও হূণরা ভারত আক্রমণ করতে সাহস পায় ?

২। হর্ষবর্ধন কিভাবে থানেশ্বর ও কনৌজ এ-দু'জায়গার সিংহাসন লাভ করেন ?

৩। হর্ষ কি কারণে 'সকল উত্তরাপথনাথ' নামে পরিচিত হন ?

৪। হিউয়েন্-সাঙ্ কি কারণে ভারতে আসেন ?

৫। পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট এই তিন শক্তির দ্বন্দ্বর কারণ কি ?

৬। বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্ককে এত গুরুত্ব দেওয়া হয় কেন ?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন (Short Essay Type)

১। গুপ্ত সম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি আলোচনা কর।

২। বাংলার পাল ও সেন যুগের সমাজ ও জীবন যাত্রায় সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। চালুক্য, কাঞ্চী ও চোল রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

দ্বাদশ অধ্যায়
বহির্বিশ্বের সহিত ভারতের যোগাযোগ
প্রথম পাঠ
যোগাযোগের মাধ্যম

সুদূর অতীত কাল থেকে ভারতের সাথে নিকটবর্তী দেশগুলির যোগাযোগ ছিল। ঐতিহাসিকদের ধারণা ভারতে সিন্ধু ও আর্য সভ্যতা গড়ে ওঠার আগে থেকেই অর্থাৎ যে যুগকে আমরা প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলি সে সময় থেকেই এরূপ যোগাযোগ ছিল। সিন্ধু ও আর্য সভ্যতার যুগে এ যোগাযোগ আগের চেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়। এ সময় থেকে প্রতিবেশী এই দেশগুলির সাথে ভারতের যোগাযোগ স্থল ও জলপথ এই দু'দিক থেকেই গড়ে উঠতে থাকে। পশ্চিমে রোম, ব্যাবিলন থেকে আরম্ভ করে মধ্য এশিয়া, চীন, তিব্বত, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, মালয় প্রভৃতি পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব দেশগুলির যোগাযোগ ঘটে। মৌর্যদের সময় থেকে এসব যোগাযোগের ইতিহাস সঠিক ভাবে জানা যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এক গ্রীক নাবিক জলপথে ভারতে আসেন। তাঁর 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থ থেকে ঐ যুগের ভারতের বন্দরগুলির নাম জানা যায়। এই গ্রন্থ ছাড়া প্লিনির বর্ণনা থেকেও এ ব্যাপারে অনেক তথ্য জানা যায়। সাধারণত মনে করা হয় যে বাণিজ্যের মাধ্যমেই এসব দেশগুলির সাথে প্রথমে ভারতের যোগাযোগ ঘটে ও পরে বাণিজ্যের সূত্র ধরে ভারতীয় শিল্প, সভ্যতা ও ধর্ম এসব দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। কালক্রমে আবার ভারতীয়রা এসব দেশে বসতি স্থাপন করে ও ভারতের বাহিরে এক 'বৃহত্তর ভারত' গড়ে তোলে। মধ্য এশিয়া, তিব্বত, নেপাল প্রভৃতি দেশগুলির সাথে এই যোগাযোগ অবশ্যই স্থল পথের মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল, আর সমুদ্র উপকুলবর্তী দেশগুলির সাথে জলপথেই এই যোগাযোগ ঘটেছিল। রোম ও পশ্চিমের অন্যান্য দেশগুলির সাথে ভারতের এই যোগাযোগ সমুদ্রপথে আলেকজান্দ্রিয়া

বন্দরের মাধ্যমেই ঘটেছিল বলে মনে করা হয় ; তবে স্থলপথেও পারস্যের মধ্য দিয়ে সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের সাথে ভারতের যোগ ছিল।
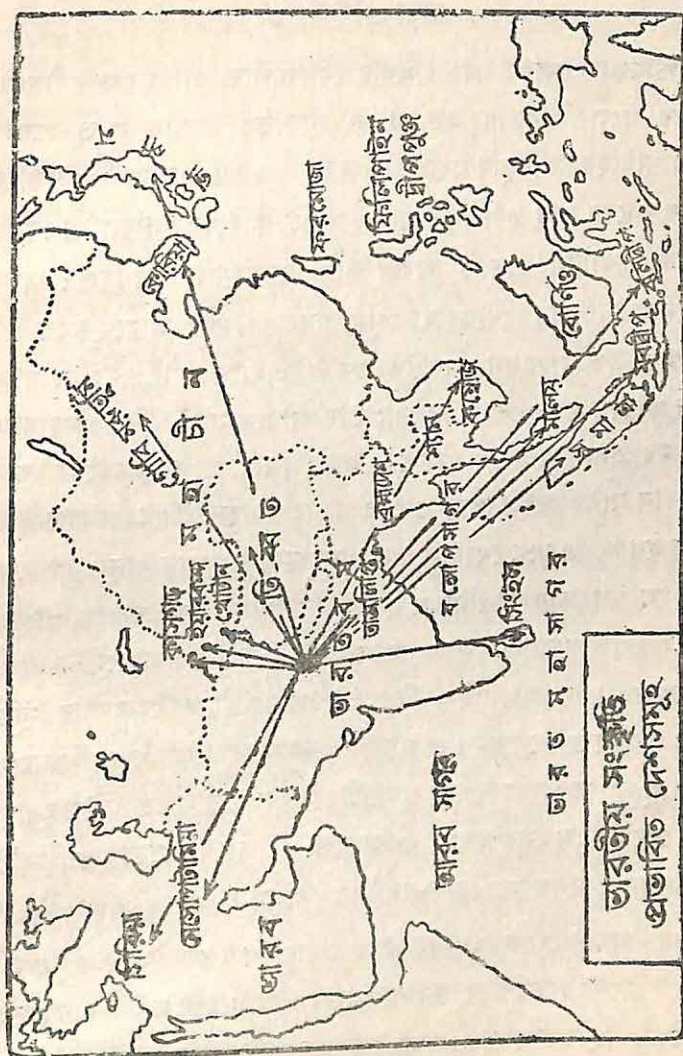
আলেকজাণ্ডারের ভারতে আসার পর থেকেই এ রাস্তার ব্যবহার শুরু হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সাথে ভারতের যোগাযোগ অবশ্যই জলপথ ধরে গড়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয় পাঠ

মধ্য-এশিয়া

প্রাচীনকাল থেকেই মধ্য-এশিয়ার দেশগুলিতে বাণিজ্য ও বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ফলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার লাভ করে। কুষাণ সম্রাটদের আদিভূমি মধ্য-এশিয়ায়। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারে তাদের দান কম ছিল না। সম্রাট কণিষ্কের আমলে কাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান প্রভৃতি অঞ্চল তাঁর সম্রাজ্যেরই অংশ ছিল ; আর তিনি নিজেই ছিলেন বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর আমলে কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্মের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ও এখানে বৌদ্ধধর্মের মহাযান মতবাদ স্বীকৃতি লাভ করে। সুতরাং তাঁর আমলে মধ্য-এশিয়ায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। বৌদ্ধধর্মের প্রতি কুষাণদের এই সমর্থনের ফলে কাস্পিয়ান সাগর অঞ্চল থেকে চীনের প্রাচীর পর্য্যন্ত এই ধর্ম একমাত্র ধর্মে পরিণত হয়। এ যুগে খোটান, কুচা, তুর্‌কান, কাশ্‌গড় প্রভৃতি অঞ্চলে একদা যে ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। স্যার অরেল্‌স্টাইন্‌ এ অঞ্চলে মাটি কেটে সে আমলের অনেক বৌদ্ধবিহার, স্তূপ, মঠ, হিন্দুমন্দির, বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি প্রভৃতি আবিষ্কার করেছেন। এ ছাড়াও এখানে বহু সংস্কৃত ও পালিভাষায় লেখা পাণ্ডুলিপিও পাওয়া গেছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন্‌সাঙ্‌ ভারত থেকে চীনে ফেরার পথে এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি লক্ষ্য করেন তাঁর বিবরণে এ কথার উল্লেখ আছে।

এসব অঞ্চল থেকে বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রসার লাভ করে, আর এই ধর্মের মাধ্যমেই চীনের সাথে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটে। চীন থেকে ফা-হিয়েন্‌, হিউয়েন্‌সাঙ্‌ ও অন্যান্য বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে ভারতে আসেন ও এদেশ থেকে বহু মূল্যবান বৌদ্ধগ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি ও বৌদ্ধমূর্তি স্বদেশে নিয়ে যান। চীনা ভাষায় অনুবাদের জন্য বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ চীনে পাঠান হয় ও বহু ভারতীয় পণ্ডিত চীনে বসবাস সুরু করেন। বৌদ্ধধর্মের যোগসূত্র ছাড়াও চীনের সাথে ভারতের

রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। অনেকই মনে করেন চীনে পাথর কেটে মন্দির তৈয়ারীর পদ্ধতি ভারত থেকেই আমদানী করা হয়েছিল। চীন থেকে বৌদ্ধধর্ম কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ সকল অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

তৃতীয় পাঠ
তিব্বত

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বত একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। এই শতাব্দীতে রাজা স্রংসান গাম্পো তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম চালু করেন। অনেকের ধারণা তিনি নেপাল ও চীন এই দু'দেশের দু'রাজ কন্যাকে বিয়ে করে তাদের প্রভাবেই তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম আমদানী করেন। ধর্মের সাথে তিনি তিব্বতে ভারতীয় বর্ণমালাও চালু করেন। খোটানে ইতিপূর্বে ভারতীয় বর্ণমালা চালু ছিল বলে অনেকের ধারণা। ফলে তিব্বতের সাথে ভারতের এক সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সুরু হয়। চীনের মত তিব্বত থেকেও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ধর্মশাস্ত্র অধ্যায়ন ও তীর্থযাত্রীরূপে ভারতে আসতে সুরু করেন। বাংলার পাল রাজারা তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রসারে বিশেষ সাহায্য করেন। পূর্ববাংলায় বিখ্যাত বাঙ্গালী পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর একাদশ শতাব্দীতে তিব্বত যান ও সেখানে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। বহুসংখ্যক বৌদ্ধগ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল। এগুলির মধ্যে 'তানজুর' ও 'কানজুর' নামে সংকলন দু'টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। বৌদ্ধধর্ম ছাড়া সিকিম ও নেপালের মধ্য দিয়ে তিব্বতের সাথে ভারতের যোগাযোগ অনেকদিন আগে থেকেই গড়ে উঠেছিল।

চতুর্থ পাঠ
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

মধ্য-এশিয়ার দেশগুলির সাথে ভারতের যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল স্থলপথ ধরে ; আর ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মালয় উপদ্বীপ, কম্বোজ, আনাম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশগুলির সাথে ভারতের যোগাযোগ

গড়ে উঠেছিল জলপথ দিয়ে। টলেমির বর্ণনাতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতের সাথে মালয়, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি দেশগুলির বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। এ অঞ্চলগুলি সুবর্ণভূমি নামে পরিচিত ছিল। বাংলা-দেশের তাম্রলিপ্ত (তমলুক) বন্দর সে যুগে এ দেশগুলির সাথে বাণিজ্যের জন্য খ্যাতিলাভ করেছিল। বাণিজ্যের সূত্র ধরে এদেশগুলিতে ভারতীয়রা বসবাস সুরু করে ও কালক্রমে তারা এসব অঞ্চলে রাজ্য পর্য্যন্ত স্থাপন করে। কোন কোন ক্ষেত্রে এসকল বংশ প্রায় হাজার বছরেরও বেশী রাজত্ব করে যান। ইন্দোচীনে চম্পা ও কম্বোজ রাজ্য এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য।

ইন্দোচীনের মূল ভূখণ্ডে চম্পা ও কম্বোজ রাজ্য দু'টি অবস্থিত ছিল। আনাম প্রদেশের প্রায় সমস্ত অঞ্চল নিয়েই চম্পা রাজ্যটি গঠিত হয়। বিহারের চম্পারণ নামের সাথে এই নামের মিল দেখে অনেকেই মনে করেন যে চম্পারণের কয়েকজন বণিক ঐ রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে ঐ রাজ্যটি গঠিত হয়। অমরাবতী ও বিজয় এ দু'টি নগর ছিল চম্পার প্রসিদ্ধ শহর। বর্মন উপাধিধারী রাজারা এ অঞ্চলে প্রায় তের'শ বছর রাজত্ব করেন। এদের মধ্যে হরিবর্মন, রুদ্রবর্মন জয়সিংহবর্মন, জয়পরমেশ্বরবর্মন প্রভৃতি রাজাদের নামে উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে এ রাজ্যটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। ভারতের মত হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম এখানে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। মোঙ্গলদের বারবার আক্রমণে এ রাজ্যটি নষ্ট হয়ে যায়।

ইন্দোচীনে আর একটি হিন্দু উপনিবেশিক রাজ্য ছিল কম্বোজ। খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে বর্তমান কাম্বোডিয়ার দক্ষিণে এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। কিংবদন্তী অনুসারে কৌণ্ডিন্য নামে একজন ভারতীয় সোমা নামে এক নাগবংশীয় রাজকন্যাকে বিয়ে করে ও কম্বোজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। চীনাদের কাছে এ রাজ্যটি ফুনান নামে পরিচিত ছিল। চীনা সূত্র থেকে জানা যায় যে ভারত থেকে আগত প্রায় এক হাজার শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ এ দেশে বাস করতেন।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে ফুনান্ রাজ্যের পতন হলে তারই জায়গায়

কম্বোজদেশ নামে এক রাজ্যের উদ্ভব হয়। কাম্বোডিয়া, শ্যাম, লাওস, মালয় উপদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশের একাংশ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এদেশের রাজারা ন'শ বছর রাজত্ব করেন। এ সকল রাজাদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও সপ্তম জয়বর্মন, যশোবর্মন ও দ্বিতীয় সূর্যবর্মনের নাম উল্লেখযোগ্য। বহু সংখ্যক সংস্কৃত লিপি থেকে এ রাজ্যের বিশদ তথ্য জানা যায়। যশোধরপুর বা আঙ্কোরথম্ এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। আঙ্কোরভাট, বেয়ন ও অন্যান্য বহু সংখ্যক মন্দির কম্বোজ রাজাদের ঐতিহ্যের সাক্ষ্য আজও বহন করছে। আঙ্কোরভাট মন্দিরটি বিষ্ণু উপাসনার জন্য স্থাপিত হয়। পৃথিবীতে এত বড় পাথরের তৈরী মন্দির আর নাই। ২১৩ ফুট এই মন্দিরটি পৃথিবীর এক আশ্চর্য বস্তু। নীচ থেকে উপরে ওঠার সিঁড়ির পাশে পুরাণে বর্ণিত নানা উপাখ্যান এই মন্দিরের গায়ে আঁকা আছে।
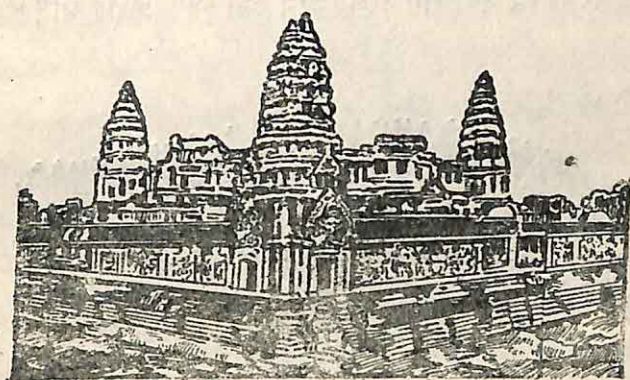
আঙ্কোরভাটের মন্দির

রাজা সপ্তম জয়বর্মন রাজধানী আঙ্কোরথমের প্রতিষ্ঠা করেন। গভীর পরিখা দিয়ে ঘেরা এই শহরের মাঝে পিরামিড আকারের থাকে থাকে নির্মিত এক বিরাট মন্দির ছিল। এটি বেয়নের মন্দির নামে পরিচিত। মন্দিরটির চূড়ায় একটি বুরুজ ছিল। বুরুজের চারদিকে চারটি ধ্যানমগ্ন শিব বুদ্ধ মূর্তি খোদিত ছিল। বেয়ন ও আঙ্কোরভাটের মন্দিরের শিল্পকলা বৃহত্তর ভারতে হিন্দু সভ্যতার এক অপূর্ব নিদর্শন।

খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে বলিদ্বীপ, বোর্ণিও, যবদ্বীপ, সেলিবিস প্রভৃতি স্থানে ভারতীয়রা রাজ্য স্থাপন করে ও এ সকল অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে। ভারতীয় রাজারা এ সকল অঞ্চলে কয়েক শ'বছর রাজত্ব করেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের সাথে এ সকল অঞ্চলে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ভারতীয় দর্শন, বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র বিশেষ সমাদর লাভ করে।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে সুমাত্রায় একটি শক্তিশালী হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর রাজধানী ছিল শ্রীবিজয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে এ স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করে। বাংলার অতীশ দীপঙ্কর এখানে এসেছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে এ রাজ্যটি শৈলেন্দ্র রাজবংশের অধিকারে আসে।

এ সকল অঞ্চলে যে সমস্ত রাজবংশ রাজত্ব করেছিলেন তাদের মধ্যে শৈলেন্দ্র বংশকেই সর্বপ্রধান বলেই মনে করা হয়। খ্রীষ্টীয় আট শতকে
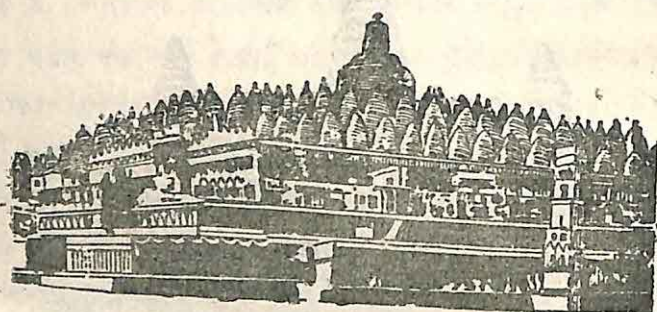
বরোবুদুরের মন্দির

মালয় উপদ্বীপে এ বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। আর ঐ শতকের শেষ দিকে সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, বোর্ণিও ও সেলিবিস প্রভৃতি অঞ্চল এদের অধিকারে আসে। শ্রীবিজয় ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। ভারত ও চীনের সাথে এ বংশের রাজাদের দূত বিনিময় হত। এরা মহাযান বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এযুগে বাংলাদেশ ছিল মহাযান বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্রস্থল। এ কারণে এরা বাংলাদেশের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন। এ বংশের রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি সংঘারাম

প্রতিষ্ঠা করবার ও তার খরচ চালাবার জন্য পাল রাজা দেবপালের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। বাংলাদেশের কুমার ঘোষ নামে একজন বৌদ্ধপণ্ডিত এই বংশের ধর্মগুরু ছিলেন। তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে প্রসিদ্ধ তারার মন্দির তৈরী হয়। যবদ্বীপে পৃথিবীখ্যাত বরোবুদুরের বৌদ্ধমন্দির এই বংশেরই কীর্তি। ত্রয়োদশ শতকে সিংহলের বিরুদ্ধে এক নৌ-অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর এই বংশের পতন হয়।

যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপ ছিল হিন্দু-সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত যবদ্বীপে বিভিন্ন হিন্দু রাজবংশ রাজত্ব করতেন। অষ্টম শতকে যবদ্বীপ শৈলেন্দ্র বংশের অধীন হয়। নবম শতকে এর কিছু অংশ স্বাধীন হয়। ত্রয়োদশ শতকে বিজয় নামে এক রাজা নূতন রাজবংশের পত্তন করেন। তিক্তবিল্ব বা মজপহিত ছিল এ রাজ্যের রাজধানী। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এ বংশের এক রাজপুত্র মলক্কায় নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজার বংশধররা মুসলমান ধর্ম (ইসলাম) গ্রহণ করেন। এদেরই প্ররোচনায় যবদ্বীপে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন হয়, আর হিন্দুরাজারা বলিদ্বীপে আশ্রয় নেন। বলিদ্বীপের অধিকাংশ লোক এখনও হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

ভারতের খুব নিকটেই ব্রহ্মদেশের নাম এ ব্যাপারে উল্লেখ করা প্রয়োজন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের অনেক আগে থেকেই এ রাজ্যের ভিতরে ও সমুদ্রের উপকুল অঞ্চলগুলিতে বহু হিন্দু উপনিবেশ গড়ে উঠতে থাকে। চীনের সংলগ্ন রাজ্য ও ব্রহ্মের অধিবাসীদের সাথে চীনাদের ভাষা ও রক্তের সম্বন্ধ থাকলেও এদেশের সভ্যতা মূলত ভারতকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। খ্রীষ্টীয় যুগের প্রথম দিকে আরাকাণ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সাথে অনেক ভারতীয় ওখানে বসতি স্থাপন করে। একাদশ খ্রীষ্টাব্দে অনিরুদ্ধ নামে এক রাজা সমগ্র ব্রহ্মদেশ ও আরাকাণে তাঁর প্রভুত্ব স্থাপন করেন। তাঁর চেষ্টায় হীনযান বৌদ্ধধর্ম ব্রহ্মদেশে প্রচারিত হয়। আজও এ ধর্ম সে দেশে চালু আছে। ব্রহ্মের সাহিত্য, শিল্প, আইন প্রভৃতি ভারতীয় প্রভাবেই গড়ে উঠেছে।

ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে সিংহল (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) অবস্থিত।

অশোকের সময় এদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। গুজরাটের (মতান্তরে মগধ অথবা কলিঙ্গ) রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয় বুদ্ধের মহানির্বাণের কিছু আগে এই দ্বীপটি দখল করেন। বিজয় 'সিংহল' বা 'সিংহবংশীয়' রাজা ছিলেন ; আর সেই থেকে এ দ্বীপের নাম হয় সিংহল। সভ্যতার সুরু থেকেই ভারতের সাথে এর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে লম্বকর্ণ নামে এক রাজা এখানে রাজত্ব করতেন। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে চোলরা এ দেশ জয় করেন। সমুদ্রগুপ্তের আমলে সিংহলরাজ মেঘবর্মনের চেষ্টায় বুদ্ধের পবিত্র দন্ত এখানে আনা হয়। বৌদ্ধধর্ম ছাড়া সিংহলের অবস্থিতি ভারতের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অন্যতম প্রধান কারণ।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions)

এক কথায় উত্তর দাও :—

১। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থ থেকে কি জানা যায় ?
২। সম্রাট কণিষ্ক কোন বর্ণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ?
৩। কোন রাজা তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম চালু করেন।
৪। মালয়, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি অঞ্চল কি নামে পরিচিত ছিল ?
৫। কোন্ রাজা আঙ্কোরথমের প্রতিষ্ঠা করেন ?
৬। শ্রীবিজয় কোন্ রাজ্যের রাজধানী ছিল ?
৭। বর্তমান শ্রীলঙ্কার আগের নাম কি ছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer Type Questions)

১। বৃহত্তর ভারত বলতে কি বোঝায় ?
২। শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের গুরুত্ব কি ছিল ?
৩। বহির্বিশ্বের সাথে ভারতের যোগাযোগ কি ভাবে ঘটেছিল ?
৪। স্যার অরেলস্টাইনের আবিষ্কারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কি ?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন (Short Essay Type)

১। বহির্বিশ্বের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
২। মধ্য ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারের ইতিহাস আলোচনা কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দিল্লীর সুলতানী আমল (১২০৬-১৫২৬ খ্রীঃ)

ভারতে তুর্কী-আফগান শক্তির অভ্যুদয়

প্রথম পাঠ

ভারতে মুসলমান অনুপ্রবেশের স্বরূপ ও উদ্দেশ্যঃ সুলতানী আমলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনঃ হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির উপর পারস্পরিক প্রভাবঃ

খ্রীষ্টীয় আট শতকের গোড়ার দিকে (৭১২ খ্রীঃ) আরবদেশের মুসলমানরা সিন্ধুদেশ জয় করে। তবে এ ঘটনার দীর্ঘকাল পরও মুসলমানরা ভারতের ভিতরে রাজ্য বা ধর্ম বিস্তার করিতে পারে নাই। দশ শতকের শেষ দিকে গজনীর সুলতানরা আবার ভারত অভিযান সুরু করে। গজনীর সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন। এ কারণে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে (১১৯২ খ্রীঃ) মহম্মদ ঘুরীর জয়লাভের সময় থেকেই ভারতে তুর্কী শক্তির অভ্যুদয় ঘটে। ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারই ছিল ঘুরীর আসল উদ্দেশ্য। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে ঘুরীর অনুচর কুতব্‌উদ্দিন আইবক্‌ সুলতান উপাধি গ্রহণ করে দিল্লীতে স্বাধীনভাবে শাসন সুরু করেন। এ কারণে এ সময় থেকে দিল্লীতে যে শাসনব্যবস্থা চালু হয় তাকে সুলতানী শাসনব্যবস্থা বলা হয়। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ পর্যন্ত এই সুলতানী শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। তবে ইতিপূর্বে ১৪১২ বা ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সুলতান মামুদের মৃত্যুর ফলে দিল্লীতে তুর্কীদের শাসন শেষ ও আফগানদের শাসন সুরু হয়। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদী বাবরের কাছে হেরে যাওয়ার পর দিল্লীতে মুঘল যুগের সূচনা হয়।

সুলতানী আমলে সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনযাত্রা ঃ ভারতে সুলতানী আমল তিনশ বছরেরও বেশী স্থায়ী

হয়েছিল। সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের বিবরণী, সাহিত্য, লোককাহিনী ও বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা থেকে এ যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কথা জানা যায়।
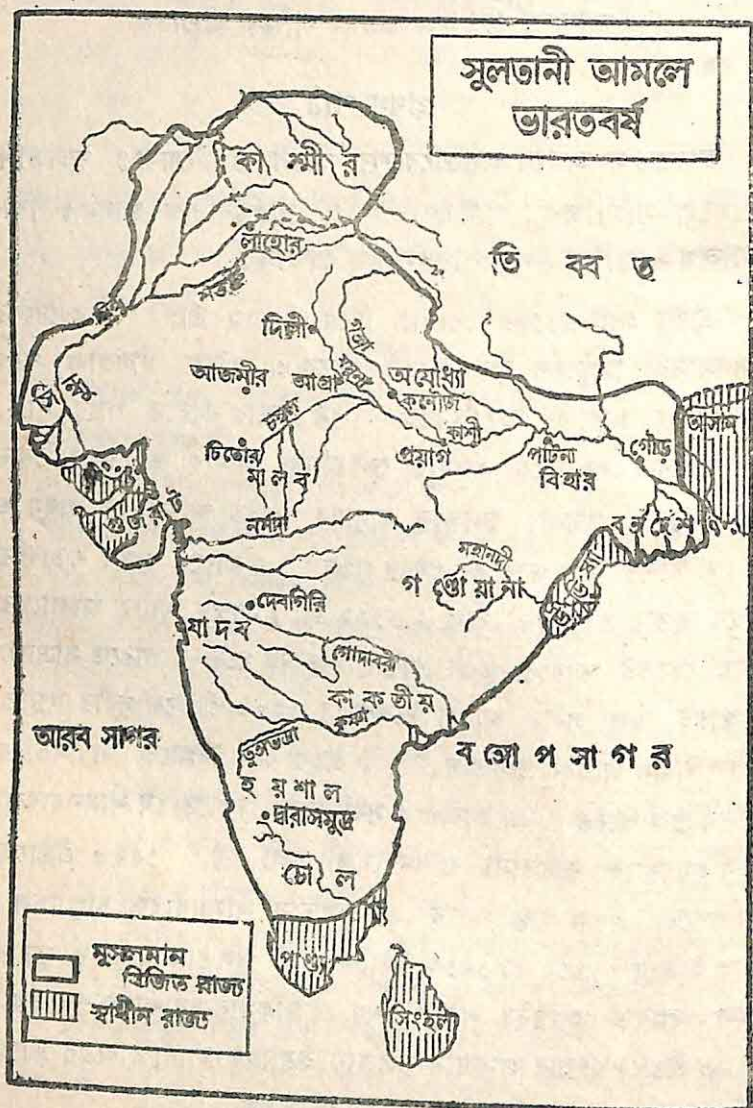
সমাজজীবন : মুসলমান অনুপ্রবেশের আগে গ্রীক, শক, কুষাণ হূণ প্রভৃতি বিদেশী আক্রমণকারীরা রাজত্ব করার সাথে এদেশের

আচার-ব্যবহার, ধর্ম প্রভৃতি গ্রহণ করে তাদের পৃথক সত্তা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। ফলে মুসলমান রাজত্বের প্রথম থেকেই ভারতীয় সমাজে বিজিত ও বিজেতা এই দুই শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। হিন্দু সমাজে যেমন জাতিভেদ প্রথা ও ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ছিল সেরূপ মুসলমানরাও শিয়া ও সুন্নী এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানরা সুলতানের সমর্থন লাভ করত, আর শিয়ারা আরবদের সিন্ধুদেশ দখলের সময় থেকে এদেশে বসবাস করছিল। মুলতান ও সিন্ধু অঞ্চলেই শিয়াদের প্রাধান্য ছিল। মোটামুটিভাবে অধিকারভোগী ও অধিকারহীন এই দু'ভাগেই সমাজ বিভক্ত ছিল। সুলতানের পরিবারবর্গ, সভাসদ, অভিজাত, উলেমা প্রভৃতিরা ছিল প্রথম শ্রেণীভুক্ত। ব্যবসায়ী, কর্মচারী, জমির মালিক প্রভৃতিদের দ্বিতীয় শ্রেণীতেই ফেলা যায়। ইবন্‌বতুতা ও আব্দুর রজ্জাকের বর্ণনা থেকে এ যুগের সমাজ ব্যবস্থার কথা ভালভাবে জানা যায়।

সুলতানী আমলে সমাজ ব্যবস্থার আর এক বিশেষ ব্যবস্থা চোখে পড়ার মত হ'ল ক্রীতদাস প্রথা। আলাউদ্দিনের সময় সরকারী খরচেই প্রায় ৫০,০০০ ও ফিরুজ শাহের আমলে দু'লক্ষ ক্রীতদাসের কথা জানা যায়। এ যুগে হিন্দুরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে গণ্য হত। আর 'জিজিয়া কর', 'তীর্থকর' প্রভৃতি নানা রকমের কর তাদের দিতে হত।

পরিবার প্রথায় দেখা যায় হিন্দু, মুসলমান দু'সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকেরা স্বামীর উপর নির্ভরশীল ছিল ও পর্দা প্রথার প্রচলন ছিল। গ্রামের মহিলারা সাধারণত সাংসারিক কাজেই দিন কাটাত। তবে উচ্চবর্ণের অনেক মহিলাদের শিল্পকলা, জ্ঞানচর্চা প্রভৃতির সুযোগ ছিল। রূপমতী ও পদ্মাবতীর নাম এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। বাল্যবিবাহ প্রথা ও কয়েকশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল।

অর্থনৈতিক জীবন : সুলতানী আমল সুরু হওয়ার আগে থেকেই ভারতের ধনসম্পদের খ্যাতি ছিল। সুলতান মামুদের বার বার ভারত

অভিযান এ কথার প্রমাণ দেয়। সুলতানী আমলেও মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের প্রচুর অর্থের অপচয় হওয়া সত্ত্বেও তৈমুর লঙ্ দিল্লী থেকে প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করে নিয়ে যান। তবে দেশের সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সুলতানী আমলে জনসাধারণের বৈষয়িক উন্নতির জন্য সামগ্রিকভাবে কোন চেষ্টা করা হয় নাই। আলাউদ্দিন খল্জীর অর্থনৈতিক সংস্কার ও কৃষির উন্নতির জন্য ফিরুজশাহের খাল খনন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কৃষি ও শ্রমশিল্প ছিল এ যুগের প্রধান উপজীবিকা। ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমেও বহুলোকের গ্রাসাচ্ছাদন জুটত। গ্রামগুলিই ছিল এযুগের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। কৃষির জন্যই দেশের সম্পদ সঞ্চিত হত। তবে উৎপাদনকারীরা এর ফলভোগী ছিলেন না। অত্যাধিক করভার, অবৈধ কর প্রভৃতির ফলে সাধারণ লোকের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। ক্ষেতমজুর ও অন্যান্য শ্রমিকরা দু'বেলা কোনরকম খেতে পেত।

কৃষির মত এ যুগে শিল্প সামগ্রী উৎপাদনের জন্য ভারতের খ্যাতি ছিল। এ যুগে শিল্প উৎপাদন বলতে কাপড়, কাগজ, মদ, চিনি ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষই বোঝাত। গুজরাট ও বাংলাদেশের সূতীবস্ত্রের খ্যাতি ছিল। এ যুগে বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনায় গ্রামীণ কুটিরশিল্প, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সুখ্যাতি দেখা যায়। ইবন্ বতুতার বর্ণনায় আবার জিনিষপত্রের খুব কম দামের কথাও বলা আছে।

সুলতান আলাউদ্দিন বিদ্রোহ প্রভৃতি দমন করবার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের হাতে অধিক সম্পদ রাখা নিরাপদ মনে করতেন না। হিন্দুদের তিনি নানা করভারে সম্পদহীন করবার পথ নেন। দেশের হিন্দুদের উপর নানা রকমের কর ছাড়াও দোয়াব অঞ্চলের হিন্দুদের রাজস্বের পরিমাণ উৎপন্ন ফসলের অর্দ্ধেক ধার্য করা হয়। সুলতান ফিরুজশাহ ইসলামের বিধান অনুযায়ী চার প্রকার কর ছাড়া অনেক অবৈধ কর তুলে দেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তিনি

নানারকমের আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্কও তুলে দেন ও কৃষির উন্নতির জন্য বহু খাল ও জলাশয় খনন করান।

রাজনৈতিক জীবন ঃ—সুলতানী আমলে দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল সুলতানের হাতে। সুতরাং তাঁর ইচ্ছাই ছিল আইন। এরূপ অবস্থায় জনসাধারণের মতামত দূরের কথা, আমাত্য বা মন্ত্রীদেরও শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে নীতি নির্দ্ধারণের কোন ক্ষমতা ছিল না। এ কারণে এ যুগের শাসন ব্যবস্থাকে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র বলা হয়। এরূপ শাসন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট হল সামরিক শক্তি। প্রকৃতপক্ষে আলাউদ্দিনের সময়ে সামরিক বিভাগই বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। ফলে সাম্রাজ্যবাদ ও শাসনতন্ত্র সামরিক শক্তির উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সুতরাং আজকালকার যুগের ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতির কথা সে যুগে ভাবাই যেত না। অনেকেই মনে করেন বিরাট সৈন্যবাহিনীর ভরণ-পোষণের জন্যই আলাউদ্দিন অর্থনীতির সংস্কার অর্থাৎ বাজার দর নিয়ন্ত্রণ করেন। ফিরুজ তুঘ্‌লক তাঁর করনীতিতে ইসলামের নিয়মনীতি মেনে চলবার চেষ্টা করেন। (ফিরুজ ছিলেন গোঁড়া মুসলমান। তার আগে থেকেই হিন্দুদের কিন্তু জিজিয়া কর দিতে হত। তবে ব্রাহ্মণদের রেহাই দেওয়া হত। ফিরুজ ব্রাহ্মণদের এই কর দিতে বাধ্য করেন) ইসলামে রাষ্ট্র ও ধর্মের কোন তফাৎ নেই। ফলে সুলতানী আমলে সুলতানদের ধর্মই রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ সুরু করে। (এরই প্রত্যক্ষ ফল হল মুসলমান রাজ্যে হিন্দুরা কয়েকটি শর্তে বসবাসের সুযোগ পায়। হিন্দুদের 'জিজিয়া' কর দান এগুলির অন্যতম।) আলাউদ্দিন অবশ্য নিজের ব্যক্তিগত প্রাধান্য স্থাপন করার জন্য রাষ্ট্রে উলেমাদের প্রভাব হ্রাস করার চেষ্টা করেছিলেন।

হিন্দু মুসলমান জীবন যাত্রায় পারস্পরিক প্রভাব ঃ—ভারতে মুসলমান শাসন সুরু হওয়ার অনেক আগে গ্রীক, শক, কুষাণ, হূণ প্রভৃতি বহু বিদেশী আক্রমণকারীরা রাজত্ব করার সাথে এদেশের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও ধর্ম গ্রহণ করে তাদের পৃথক স্বত্তা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা গেল। ফলে

হিন্দু মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে পারস্পরিক এক বৈরী মনোভাবও বিরাজ করে। কিন্তু দীর্ঘকাল একই দেশে পাশাপাশি বসবাসের ফলে প্রথমদিকের এই মনোভাব কেটে গিয়ে এই দুই সভ্যতা পরস্পরকে প্রভাবিত করতে থাকে। ফলে পারস্পরিক এই বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতার মনোভাব সদ্ভাব ও সহিষ্ণুতায় রূপান্তরিত হয়। উপনিষদের একেশ্বরবাদ মুসলমান পণ্ডিতদের হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান করে তোলে। এছাড়া হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিয়েথাওয়া প্রভৃতি সম্পর্কের ফলে অনেক হিন্দু রীতিনীতি মুসলমান সমাজে প্রবেশ করে। অন্যদিকে আবার বহু হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করা সত্বেও ধর্ম ছাড়া আর প্রায় সব ব্যাপারেই হিন্দুদের মত জীবন যাপন করত। সরকারী কাজকর্মের সুবিধার জন্যও আবার বহু হিন্দূ আরবী, ফারসী ভাষা শেখে ও মুসলমান আদব-কায়দা রপ্ত করে। ইবনবতুতার বর্ণনায় অনেক মুসলমান রমণীর জহরব্রত পালনের কথা বলা আছে। হিন্দুদের মধ্যে মুসলমান পীর ও ফকিরের প্রতি শ্রদ্ধা, আর মুসলমানদেরও হিন্দু সাধু, সন্ন্যাসীদের প্রতি আস্থা এই দুই সম্প্রদায়কে খুব নিকট করে আনে। এরূপ মনোভাবের ফলেই অনেক সময় হিন্দুরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেও আবার স্বধর্মে ফিরে আসতে পারত। উদাহরণ হিসাবে বিজয় নগরের প্রতিষ্ঠাতা হরিহর ও বুক্কর নাম করা যেতে পারে।

শিল্পকলায় হিন্দু-মুসলমান রীতির প্রভাব ঃ দিল্লীর অধিকাংশ সুলতানই স্থাপত্য শিল্পের অনুরাগী ছিলেন। ফলে এযুগে বহু জায়গায় সুন্দর সুন্দর মসজিদ, সমাধিভবন ও প্রাসাদ তৈয়ারী হয়। এ গুলির গঠন রীতিতে হিন্দু-মসলিম স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। এই নূতন ধরণের শিল্পরীতি 'ইন্দো-মুসলিম' বা 'ইন্দো-সারাসেনীয়' নামে পরিচয় লাভ করে। প্রথম দিকে মুসলমানদের মসজিদ ও প্রাসাদগুলির গঠন ছিল সাধাসিদে ও এতে কোন সুক্ষ্ম কারুকার্য থাকত না। ভারতে অর্থাৎ হিন্দু স্থাপত্য শিল্পে এরূপ সুক্ষ্ম কারুকার্যের বহুল ব্যবহার ছিল। সুলতানরা প্রাসাদ মসজিদ প্রভৃতি নির্মাণে হিন্দু

শিল্পীদের নিয়োগ করতেন। ফলে এ গুলির নির্মাণের সময় দুই শিল্পরীতির সংমিশ্রণ ঘটে। এ ছাড়া বহু জায়গায় হিন্দু মন্দিরকে সামান্য পরিবর্তন করে মস্‌জিদে পরিণত করা হত। ফলে মস্‌জিদ-গুলিতে স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যের মিশ্রণ ঘটতে থাকে। এর উপর আবার স্থানীয় শিল্প-রীতির প্রভাবের কথাও আছে। দিল্লী, গুজরাট, জৌনপুর ও বাংলাদেশের স্থাপত্য-শিল্পরীতিতে কিছু-কিছু স্থানীয় প্রভাব ছিল। দিল্লীর 'কুতব্‌ মিনার', মস্‌জিদগুলি ও স্মৃতি-সৌধগুলিতে মুসলমান রীতির প্রভাব দেখা যায়। আবার জৌনপুরের প্রসিদ্ধ 'আতাল মস্‌জিদ' ও 'জাম-ই-মস্‌জিদে' স্থানীয় শিল্পরীতির প্রভাব দেখা যায়। গুজরাটের 'তিন-দরওয়াজা' 'জাম-ই-মস্‌জিদ' (আহ্‌মদাবাদ); গৌড়ের 'সোনা মস্‌জিদ,' 'লোটন মস্‌জিদ' ; পাণ্ডুয়ার 'আদিনা মস্‌জিদ' ও 'একলাখী সমাধিভবন' এ যুগের স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পে ইঁটের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি ঃ ভারতে তুর্কী শাসন চালু হওয়ার সাথে সংস্কৃত ভাষা রাজানুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হয়। তবুও দেশের প্রাচীন শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে ব্রাহ্মণরা সংস্কৃতের চর্চা চালু রাখেন। অপরদিকে লৌকিক ভাষা ও পল্লী সাহিত্যের উত্তরোত্তর বিকাশলাভ এ যুগের সংস্কৃতির বিশিষ্ট দান বলা চলে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মপ্রচারকদের স্থানীয়ভাষায় ধর্ম প্রচারের ফলে বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাঠী ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। এ যুগের আমীর খুসরু তাঁর সাহিত্যে হিন্দীও ফারসীর বহুল ব্যবহার করেন। এই দুই ভাষার সংমিশ্রণেই উর্দু ভাষার সৃষ্টি। সেজন্য খুসরুকে উর্দু সাহিত্যের আদি লেখক বলা হয়ে থাকে।

বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য যে সমস্ত সুলতানের নাম অক্ষয় হয়ে আছে তাদের মধ্যে ইউসুফশাহ, হুসেনশাহ ও নসরৎশাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইউসুফশাহের পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু 'শ্রীমদ্ভাগবতের' বাংলা অনুবাদ করেন। নস্‌রৎশাহের আদেশে 'মহাভারতের' বাংলা সংস্করণ রচিত হয়। নস্‌রতের সেনাপতি পরাগল খাঁ ও পরাগলের পুত্র ছোটেখাঁ মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করেন। ইতিপূর্বে বাংলায় 'রামায়ণ' রচয়িতা কৃত্তিবাস গৌড়ের এক রাজার অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন।

দ্বিতীয় পাঠ

হিন্দু-মুসলমান সমন্বয় প্রচেষ্টা : ভক্তিবাদ

ভারতের মুসলমানদের শাসন (সুলতানী আমল) সুরু হওয়ার সময় থেকেই মুসলমানরা নিজেদের পৃথক স্বত্বা সব ক্ষেত্রেই মেনে চলত। মুসলমানদের কঠোর একেশ্বরবাদ স্বধর্মের প্রতি মর্যাদা, পৌত্তলিক ধর্মের প্রতি ঘৃণা ও তার উপর এদেশে রাজশক্তি হিসাবে এরা সব সময়ে হিন্দুদের কাছ থেকে দূরে থাকত। হিন্দুরাও ইসলামের সংস্পর্শ থেকে স্বধর্ম রক্ষার জন্য সমাজে কঠোর বাধা আরোপ করে। রাজশক্তি সমর্থন পুষ্ট ইসলাম হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণের মধ্যে প্রবেশ করল বটে, কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতে এর সেরূপ সাফল্য এল না। এর প্রথম কারণ হল এযুগে হিন্দুদের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে এক অদ্ভুত রক্ষণশীল মনোভাব গড়ে উঠে। দক্ষিণের মাধবাচার্য ও বাংলার রঘুনন্দন এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা নেন। দীর্ঘকাল পর মুসলমানরা অনুভব করল যে হিন্দুদের সম্পূর্ণভাবে ধর্মান্তরিত করা যাবে না ; আর হিন্দুরাও দেখল যে মুসলমানদের এদেশ থেকে বিতাড়ন সম্ভব নয়। সুতরাং একই দেশে পাশাপাশি বাস করতে হলে একটা আপোষ দরকার। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে যে সকল হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা ধর্ম ছাড়া আচার ব্যবহার, ভাষা প্রভৃতিতে প্রায় হিন্দুদের মতই জীবন যাপন করত। এ সকল কারণ ছাড়াও প্রথম দিকের কথা বাদ দিলে হিন্দুদের মধ্যেও ইসলামের একেশ্বরবাদ, সমাজে শ্রেণী বা জাতি না থাকা, ধর্মের অনাড়ম্বরতা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এভাবে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের এরূপ এক মনোভাব থেকেই এই দুই পৃথক সংস্কৃতির সংমিশ্রণ বা সমন্বয়ের প্রচেষ্টা দেখা দেয়। আর এই প্রচেষ্টা সুফী মতবাদ, ভক্তিবাদ, সাধকদের প্রচার, শিল্প ও সাহিত্যের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছিল।

অল্-বিরুনী ও আমীর খুসরুর মত চিন্তাশীল মুসলমানরা হিন্দু-সংস্কৃতির মহত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। এ কারণে অল্-বিরুনী সংস্কৃত শিখে হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। আমীর খুসরু মূর্তিপূজার মধ্যে

গভীর দর্শন উপলব্ধি করেছিলেন। হিন্দুদের প্রতি এই উদার মনোভাব বাংলাদেশের হুসেন শাহ ও কাশ্মীরের জৈন-উল-আবেদীনের রাজত্বকালে দেখা গিয়েছিল। হুসেন শাহের উৎসাহে বাংলা ভাষায় 'মহাভারত', 'শ্রীমদ্ভাগবত' ও 'গীতা' অনুবাদ করা হয়েছিল। তিনি বৈষ্ণব পণ্ডিত রূপ ও সনাতনকে উচ্চ রাজপদ দান করেছিলেন। কাশ্মীরের জৈন-উল-আবেদীনও 'মহাভারত' ও 'রাজতরঙ্গিনী' পারসিক ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। আর হিন্দুদের উপর থেকে তিনি জিজিয়া কর উঠিয়ে দেন।

মুসলমান সম্প্রদায়ের এ সময়ে সুফীমতের প্রচারক একাধিক সাধকের পরিচয় পাওয়া যায়। বেদান্তের দার্শনিক চিন্তার সাথে ইসলামের সমন্বয়ের উপরেই সুফী মতবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুলতানী আমলে সুফী সাধকদের মধ্যে নিজামুদ্দিন আউলিয়া ও মৈনুদ্দীন চিস্তির নাম অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ভক্তি ধর্মের মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু মুসলমান এই দু'সম্প্রদায়ের পরস্পর বিরোধী ভাবধারাকে এক নূতন সহনশীল মনোভাবে রূপান্তরিত করা। ঈশ্বর কেবল ভক্তির দ্বারা লাভ করা যায়, আর ঈশ্বরের ভক্তির কাছে কোন জাতি, কুল অথবা সম্প্রদায়ের বিচার নাই—এই হল ভক্তি-বাদের মূল কথা। মধ্যযুগে ভক্তি আন্দোলনের সূচনা করেন রামানন্দ। দক্ষিণ ভারতে রামানুজ যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তন করেন সেই ধর্মের পঞ্চম সাধক হিসাবে রামানন্দ বিশেষ পরিচিত ছিলেন। জাতিভেদ অস্বীকার করে তিনি নীচ জাতি থেকে শিষ্য গ্রহণ করেন ও ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি এক নূতন ধারার সৃষ্টি করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কবীর ছিলেন মুসলমান ও তন্তুবায় সম্প্রদায়ের লোক। ভক্তির দ্বারা ভগবান লাভ করাই ছিল

কবীর

তাঁর জীবনের ও ধর্মের মূলমন্ত্র। তিনি সকলের বোধগম্য সরল হিন্দী ভাষায় দোঁহা রচনা করে উপদেশ দিতেন। এই দোঁহাগুলি হিন্দী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। কবীরের মৃত্যুর পর কবীরপন্থী নামে এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।

ভক্তি ধর্মের আর একজন প্রধান আচার্য ছিলেন শ্রীচৈতন্য। নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে তিনি 'জীবে দয়া, প্রেম ও ভক্তি'র প্রচার সুরু করেন। তিনি মনে করতেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে বিরাজ করছেন। সেজন্য তিনি প্রতিটি বৈষ্ণবকেই নিরহঙ্কারী ও বিনয়ী হওয়ার কথা বলেন। জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় প্রভৃতি সব বাধা তুচ্ছ করে তিনি মানুষের মধ্যে প্রেম ও ভালবাসার বাণী প্রচার করতেন। যবন হরিদাস ছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্যদের অন্যতম। পুরীর নীলাচলে তিনি মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন (আঃ ১৫৩৩ খ্রীঃ)।

শ্রীচৈতন্য

এ যুগের অপর একজন পৃথিবী খ্যাত ধর্ম সংস্কারক হলেন গুরু নানক। ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দের আজকালকার পাকিস্তানের তালবন্দী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকে তাঁর ধর্মের আসক্তির ফলে পার্থিব কোন জিনিষই তাঁকে সুখ দিতে পারে নাই। সত্যের সন্ধানে তিনি

সুদূর মক্কা পর্য্যন্ত যান। কবীরের মত তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করেন ও জাতিভেদ প্রথাকে নিন্দনীয় মনে করতেন। বিভিন্ন ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসাই নানকের ধর্মের মূল অঙ্গ। ধর্মের জটিল ও বাহ্যিক আড়ম্বর থেকে মুক্ত হয়ে 'সৎ, শ্রী, আকাল' অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ভগবানের আরাধনাই ছিল নানকের ধর্মের মূল কথা। হিন্দু মুসলমান সকলকেই তিনি শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁর শিষ্যদের নাম ছিল 'শিখ'। এ থেকেই শিখ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। তত্ত্বকথা অপেক্ষা চিত্তের শুচিতা, দয়া, প্রেম, প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলির উপর নানক জোর দিতেন।

গুরু নানক

তৃতীয় পাঠ

বাংলাদেশ: ইলিয়াসশাহ ও হুসেনশাহের আমলে বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থ নৈতিক জীবন

দিল্লীর সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে (১৩২৫-১৩৫১ খ্রীঃ) বাংলার নানা জায়গায় বিদ্রোহ হয়, আর সোনার গাঁও, লখনৌতী ও সাতগাঁও স্বাধীন হয়। ইতিপূর্বে বাংলাদেশকে দিল্লীর অধীনে রাখার ও শাসনের সুবিধার জন্য তিনটি পৃথক প্রদেশে ভাগ করা হয়েছিল। এই তিন অঞ্চলের তিন রাজধানী ছিল সোনারগাঁও, লখনৌতি ও সাতগাঁও। লখনৌতীর (উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ) স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহকে হত্যা করে হাজী ইলিয়াস নামে একজন সিংহাসন দখল করেন (১৩৪২ খ্রীঃ)। শাসন ক্ষমতা নেওয়ার সময় ইনি শাম্‌সুউদ্দিন ইলিয়াস শাহ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। লখনৌতীতে তিনি এভাবে ইলিয়াস শাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। শাম্‌সুউদ্দিন ১৩ ৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

রাজত্ব করেন। তাঁর পর থেকে এ অঞ্চলে বেশ ক'জন স্বাধীন শাসকের নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে হুসেনশাহের (১৪৯৯-১৫১৯) নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায়। এই দুই ভিন্ন বংশীয় সুলতানের আমলে বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন দেখা দেয়।

বাংলাদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই হিন্দু সমাজে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মুসলমানদের সংস্পর্শে আসার ফলে উচ্চ-বংশীয় হিন্দুদের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-পানীয়, আচার-ব্যবহার প্রভৃতিতে পরিবর্তন আসে। ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহ হিন্দুদের রাজকাজে উচ্চপদ দান করতেন। হুসেন শাহের আমলে হিন্দু উজীর, সেনাপতি কর্মাধ্যক্ষ, রাজস্ব সচিব, প্রধান চিকিৎসক প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। পুরন্দর খাঁ, গৌর মল্লিক, রূপ, সনাতন প্রভৃতির নাম এ ব্যাপারে উল্লেখ-যোগ্য। অন্যদিকে আবার নিম্ন জাতীয় হিন্দুরা ইসলামের সাম্যবাদে আকৃষ্ট হয় ও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। এ অবস্থায় হিন্দু সমাজ ও ধর্মকে রক্ষার জন্য সংস্কারকগণ তৎপর হয়ে উঠল। স্মৃতি শাস্ত্রের মহাপণ্ডিত রঘুনন্দনের নাম এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক। আঠাশটি নিবন্ধের সাহায্যে তিনি বাঙ্গালী হিন্দুদের সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে বিধি নিষেধ নির্দিষ্ট করে দেন। এর ফলে হিন্দু সমাজের এক অংশ বেশ রক্ষণশীল হয়ে পড়ে ও আর এক অংশ ইসলামের একেশ্বরবাদ, জাতিভেদ প্রথা না থাকা ইত্যাদিতে আকৃষ্ট হয়ে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে এক সেতুবন্ধ রচনা করতে চান। জীবে দয়া, ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি ছিল এদের মূল বক্তব্য। শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন এ মতের প্রধান উদ্যোক্তা।

এ যুগে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিতদের মধ্যে শূলপাণি ও শ্রীনাথ আচার্য বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এ ছাড়া এ যুগের চতুর্ভুজের মহাকাব্য 'হরিচরিত' রূপ গোস্বামীর 'হংসদূত', 'উদ্ধবসন্দেশ' 'দানকেলি', 'কৌমুদী', 'পদ্যাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

এ সময় বাংলা ভাষাতেও অনেক প্রথম শ্রেণীর কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়। সুলতান হুসেন শাহের আমলে বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। কবি মালাধর বসু 'শ্রীমদ্ভাগবতের' কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ করে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি লাভ করেন। এ ছাড়া এ আমলে 'মহাভারতের' কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ হয়। এ যুগে আরবী ও ফারসী সহিত্যের উন্নতি হয়েছিল।

মুসলমান যুগে বাংলাদেশে প্রত্যেক সুলতান তার নিজের নামে মুদ্রা চালু করতেন। এই মুদ্রাগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে ও এগুলি এ যুগের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় দেয়। এ যুগে বাংলাদেশ ধন সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। এর কারণ হল মাটির উর্বরতা, ব্যবসা বাণিজ্য আর দেশের শস্য ও সম্পদ দেশেই থাকত। মুঘল আমলে বাংলাদেশ একটি সুবায় (প্রদেশে) পরিণত হয়। ফলে কর বাবদই অনেক সম্পদ এদেশ থেকে চলে যেত। চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দে ইব্‌নবতুতা লিখেছেন যে বাংলাদেশে অনেক ধান হ্ত। অন্যান্য বর্ণনা থেকেও জানা যায় যে বাংলাদেশে ধান এত উৎপন্ন হত যে বাংলার চাহিদা মিটিয়ে বাইরে রপ্তানি করা হত। সমুদ্রপথে বিদেশ-বাণিজ্যেরও এযুগে প্রচলন ছিল। চিনি উৎপাদন থেকেও দেশের অর্থাগম হত। শিল্পের মধ্যে বস্ত্র শিল্পের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতে বহুলোকের অন্নসংস্থান হত। বাংলার মসলিনের বিশ্বখ্যাতি ছিল।

সুলতানী শাসন ব্যবস্থা : দিল্লীর সুলতানী শাসন ব্যবস্থা নীতিগতভাবে দিব্যতন্ত্রের (যাজক সম্প্রদায় প্রভাবিত) উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলামের বিধান অনুযায়ী ইহার প্রয়োজন ছিল। সুলতান ছিলেন ইউরোপের পোপ ও সীজার। এর কারণ হল ইসলামে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে আলাদা করে দেখা হয় না। এরূপ ক্ষমতা পাওয়ার ফলে অধিকাংশ সুলতানই ছিলেন স্বৈরাচারী। এ ব্যাপারে সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জী ও সুলতান মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। সুলতান আলাউদ্দিন অবশ্য নিজের ক্ষমতা বাড়াবার উদ্দেশ্যে যাজক অর্থাৎ

উলেমাদের ক্ষমতা কমাতে চেয়ে ছিলেন। তবে উলেমা, মন্ত্রী প্রভৃতিরা সুলতানকে পরামর্শ দিতেন ; কিন্তু তাদের নিজস্ব কোন ক্ষমতা ছিল না। সুলতানের পক্ষে অবশ্য রাষ্ট্রের সব কাজ একা দেখাশোনা করা সম্ভব ছিল না। এ কারণে তিনি বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের ওপর বিভাগীয় দায়িত্ব দিতেন আর রাজবংশের লোকেরাই সাধারণত প্রদেশের সর্ব্বোচ্চ পদগুলিতে নিযুক্ত থাকতেন। এ ভাবে শাসন ব্যবস্থায় এক বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এরা খান, মালিক, আমীর প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন। সুলতান এদের সাথে 'বার-ই-খাস' অর্থাৎ রাজসভায় মিলিত হতেন। দেশের 'বার-ই-আম্' (সর্বোচ্চ বিচারালয়) সুলতানের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হত। রাষ্ট্রের প্রধান অমাত্যকে বলা হত 'উজীর'। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সকল বিভাগের উপর নজর রাখতেন।

আলাউদ্দিন খল্‌জী

মহম্মদ-বিন-তুঘ্‌লক

শাসন কাজের সুবিধার জন্য সারা দেশ কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এগুলির সংখ্যা ছিল ২০ থেকে ২৫। এগুলির শাসন কর্তাদের বলা হত নায়েব সুলতান। কেন্দ্রের মত প্রদেশেও এরা স্বৈরাচারী শাসন চালাত। প্রদেশগুলির

খরচ বাদ দিয়ে তারা তাদের আয়ের উদ্বৃত্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঠিয়ে দিত। কেন্দ্রীয় সরকারের মত প্রদেশেও এদের সেনাবাহিনী থাকত। জমির রাজস্ব ছিল এযুগে সরকারী আয়ের প্রধান উৎস।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions)

১। আরবদেশের মুসলমানরা কোন্ সময়ে সিন্ধুদেশ জয় করে ?

২। স্থলতান মামুদের ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য কি ছিল ?

৩। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল ?

৪। কুতব্‌উদ্দিন কে ছিলেন ?

৫। মাধবাচার্য কোন অঞ্চলের লোক ?

৬। হুসেন শাহ কোথাকার স্থলতান ছিলেন ?

৭। শ্রীচৈতন্য কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ?

৮। গুরু নানকের শিষ্যদের কি বলা হয় ?

৯। কোন্ স্থলতানের আমলে 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচিত হয় ?

১০। কবি মালাধর বসু কি জন্য 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি পান ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer Type)

১। ভক্তিবাদের মূল কথা কি ?

২। গুরু নানকের মূল উপদেশ কি ?

৩। রঘুনন্দন কি ভাবে হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা বজায় রাখতে চেয়েছিল।

৪। স্থলতানী শাসন ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ কি ছিল ?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন (Short Essay Type)

১। ভক্তিবাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। বাংলাদেশে ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহের রাজত্বকালের বৈশিষ্ট্য-গুলির বিবরণ দাও।

৩। স্থলতানী শাসন ব্যবস্থার নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ।

চতুর্দশ অধ্যায়

মধ্যযুগের সমাপ্তি ঃ আধুনিক যুগের সূচনা

(চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী)

প্রথম পাঠ

কনস্টান্টিনোপলের পতন ঃ ইউরোপে রেনেসাঁসের উপর প্রভাব ঃ

আমরা আগেই পড়লাম যে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে (৪৭৬ খ্রীঃ) 'বর্বর' জাতিগুলির আক্রমণে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল এবং ইউরোপে এরপর থেকে যে যুগ স্বরু হয় তাকে সাধারণতঃ 'অন্ধকারের যুগ' বলে চিহ্নিত করা হয়। এ সময় থেকে আবার ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের স্বরু বলেও ধরে নেওয়া হয়। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরেও আরও প্রায় এক হাজার বছর কনস্টান্টিনোপলকে কেন্দ্র করে পূর্ব রোম সাম্রাজ্য বা বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য টিকে ছিল। জার্মান জাতিদের আক্রমনে যেমন পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল তেমনই পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল তুর্কীদের আক্রমণে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই ওসমান বা অটোমান তুর্কীরা এশিয়া মাইনরে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করে ও বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের জায়গা দখল করতে স্বরু করে। স্বভাবতই কনস্টান্টিনোপল দখল করে সমস্ত বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য দখল করে নেওয়াই ছিল এদের উদ্দেশ্য। প্রথম কয়েক বার বিফল হলেও ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ (১৪৫১-৮১ খ্রীঃ) এই আক্রমণ জোরদার করেন এবং জল ও স্থলপথে কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেন। প্রায় সাত সপ্তাহ অবরোধের পর মে মাসের শেষে তুর্কীরা কনস্টান্টিনোপল দখল করে নেয় ও প্রচুর লোকের জীবন হানি ঘটে, সম্পত্তি, মঠ ও গীর্জা, বাড়ীঘর প্রভৃতি ধ্বংস হয়। কনস্টান্টিনোপলের পতনের সাথে বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যও ধ্বংস হয়ে যায়। এ কারণে এ বছরটিকে ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের শেষ বলে মনে করা হয়।

কনস্টান্টিনোপলের পতনে ইউরোপের উপর এর প্রভাব ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ের বেশ আগে থেকেই ইউরোপের প্রাচীন গ্রীক

ও রোমানদের সাহিত্য, দর্শন, শিল্প ও জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে চর্চার পুনরুদ্ধার হতে সুরু হয়েছিল। কনস্টান্টিনোপলের পতনের সময় বহু গ্রীক পণ্ডিত তাদের মূল্যবান পুঁথিপত্র নিয়ে ইউরোপের অনেক জায়গায় বিশেষত ইটালীতে আশ্রয় নেন। ইতালীর নগর রাজ্যগুলিতে ইতিপূর্বে এসব জ্ঞান চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল। এসব আশ্রয়প্রার্থী পণ্ডিতদের আগমনের ও বসবাসের ফলে এই প্রাচীন জ্ঞান চর্চার আরও প্রাবল্য দেখা দেয়। প্রাচীন গ্রীক পুঁথিগুলির অনুবাদ এ সময় থেকে বেশ সহজ হয়ে উঠে ও এছাড়া এসব পণ্ডিতরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যাপনারও সুযোগ পান। প্রাচীন শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, আইন, দর্শন ও বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে জ্ঞানলাভও ছাত্রদের পক্ষে সহজ হয়ে উঠে। এর ফলে ইটালী তথা ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে যে নূতন ভাবধারা গড়ে উঠে তাকে সাধারণত ইউরোপের নবজাগরণ বা রেনেসাঁস বলা হয়।

দ্বিতীয় পাঠ

ইউরোপে 'রেনেসাঁস' বা নবজাগরণ

মধ্যযুগে মানুষের জীবন ছিল সংকীর্ণ। সমাজে রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব ছিল অপরিসীম। এই চার্চের উপর প্রভুত্ব করতেন পোপ। রাজারাও পোপকে অমান্য করতে সাহস করতেন না। যাজকরাই ছিল এ যুগে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ। এ যুগে ধর্মসংক্রান্ত শিক্ষা ছাড়া আজকালকার মত শিক্ষার চলন ছিল না। ফলে মানুষের জীবনে ধর্ম ও পারলৌকিক চিন্তা ছাড়া অন্য কিছু ছিলনা। বৈষয়িক দিকের চেয়ে আধ্যাত্মিক দিকই মানুষকে পেয়ে বসেছিল। এ যুগের মানুষ নানা ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পার্থিব সুখভোগ তারা একরকম পাপ বলেই মনে করত। কিন্তু এ যুগে ধর্মব্যবস্থার অর্থাৎ চার্চগুলির মধ্যেই নানা দুর্নীতি গড়ে উঠে ও চিন্তাশীল মানুষদের মধ্যে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে প্রচলিত সমাজ ও ধর্ম ব্যবস্থার প্রতি অনেকেরই দ্বিধা দেখা দেয়। এ সময়ে প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের সাহিত্য, দর্শন,

বিজ্ঞান ও শিল্পকলার চর্চা নূতনভাবে সুরু হয়। এর ফলে সে সব প্রাচীন আমলে এই দুই সভ্য জাতিতে যে ধর্ম আলোচনার সাথে জীবনের আরও সব ব্যাপারই আলোচনা করতেন তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। চতুর্দশ শতাব্দীতে ক্যাথলিক চার্চের বিভেদ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রচলিত ধর্ম সম্বন্ধে বিতৃষ্ণার ভাব আরও বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে প্রাচীন দর্শন প্রভৃতি আলোচনা করে এটাই বোঝা গেল যে সে যুগের পণ্ডিতরা কোন কিছুই প্রশ্ন বা যুক্তি ছাড়া গ্রহণ করতেন না। আর পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেও তারা পাপ বলে মনে করতেন না। ফলে মধ্যযুগের শেষ দিক থেকে ইউরোপের পণ্ডিতরা জীবনের বহু বিষয় সম্বন্ধে জানবার জন্য যেমন কৌতুহলী হয়ে উঠেন, তেমনই তারা মধ্যযুগের কুসংস্কারগুলিকে কাটিয়ে এক যুক্তিসম্মত ও স্বাধীন চিন্তাধারায় পুনঃ প্রবর্তন করলেন। ইউরোপের এই নূতন ভাবধারাকে ঐতিহাসিকরা এক কথায় নাম দিয়েছেন 'রেনেসাঁস' বা নবজাগরণ। ইটালীর নগর রাজ্যগুলি এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা নেয়। উদাহরণ হিসাবে ফ্লরেন্স, মিলান, ন্যাপলস্, ভেনিস ও জেনোয়ার নাম করা যায়। ইটালী থেকে ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলেও এই ভাবধারা বিস্তৃত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কনস্টান্টিনোপল থেকে বহু গ্রীক পণ্ডিত তাদের পুঁথিপত্র নিয়ে ইউরোপে চলে আসেন ও তারা এই নূতন ভাবধারাকে আরও জোরদার করেন। 'রেনেসাঁস' যুগে এ সকল পণ্ডিতরা 'স্কুলমেন' নামে পরিচিত ছিলেন।

'রেনেসাঁসের' বৈশিষ্ট হল অজানাকে জানা। বিজ্ঞানের নানা শাখায় চর্চার ফলে নূতন আবিষ্কার, দর্শনের গভীর তত্ত্বের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান, সৌন্দর্য্যের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণের অভিব্যক্তি হিসাবে নানারূপ শিল্পসৃষ্টি ও প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন।

তৃতীয় পাঠ

রেনেসাঁসের অবদান : ভৌগোলিক আবিষ্কার প্রভৃতি

'ইউরোপের ইতিহাসে' রেনেসাঁসের অবদান ছিল বহুমুখী ও সুদূরপ্রসারী। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার সাথে ভৌগলিক আবিষ্কার ইউরোপবাসীর কাছে সারা পৃথিবীকে উন্মুক্ত করে দেয়। নাবিকের কম্পাস,

সমুদ্রের মানচিত্র প্রভৃতির সাহায্যে সমুদ্র যাত্রা সহজ হয়, নূতন দেশ আবিষ্কৃত হয় ও এই দেশগুলির সাথে ইউরোপের যোগাযোগ সুরু হয়। এর ফলে আবার ব্যবসা-বাণিজ্য উপনিবেশ প্রভৃতির প্রশ্ন নিয়ে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি, বিশেষত সমুদ্রউপকূলবর্তী দেশগুলি, যেমন ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, হল্যাণ্ড, প্রভৃতি দেশগুলির উপনিবেশ স্থাপন ও বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হয়। আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল এভাবে এদের আধিকারে আসে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাস জানতে হলে ইউরোপের এই দেশগুলিকে বাদ দিয়ে জানা সম্ভব নয়।

মধ্যযুগে পোপ ইউরোপের পার্থিব ও অপার্থিব এ দু'জাতেরই সর্বময় কর্তা ছিলেন, আর এ কারণে তিনি নানারূপ কর আদায় করতেন। এ সময় জাতীয়তাবাদ বলতে কিছুই ছিল না। ইউরোপের অধিবাসীরা খ্রীষ্টান হিসাবেই নিজেদের পরিচয় দিত। কিন্তু এই নতুন চিন্তাধারার ফলে জাতীয়তাবাদের এক ভাব গড়ে উঠে ও পশ্চিম ইউরোপের লোকেরা প্রাথমিকভাবে নিজেদের ইংরেজ, ফ্রেঞ্চ, স্পেনীশ, ডাচ প্রভৃতি ভাবতে শেখে ও তাদের আনুগত্য নিজ নিজ দেশের রাজাদের প্রতি দেখাতে সুরু করে। মধ্যযুগের শেষে ইউরোপের দেশগুলিতে জাতীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি এর প্রত্যক্ষ ফল বলা যায়। এর কারণ হিসাবে বলা যায় মধ্যযুগে রাজতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ায় সামন্তদের প্রাধান্য সুরু হয়। কিন্তু ধর্মযুদ্ধগুলির (ক্রুসেড) পর থেকেই সামন্তদের দিন শেষ হতে সুরু করে ও সামন্তদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে ব্যবসাদার, শিল্প মালিক প্রভৃতিরা এগিয়ে আসে। এরাই সমাজে মধ্যবিত্ত বা 'বুর্জোয়া' শ্রেণী নামে পরিচিত হয়। এইভাবে রাজাকে কেন্দ্র করেই জাতীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে ইংল্যাণ্ডে সপ্তম হেনরীর সিংহাসন লাভ ও টিউডর যুগের সূচনা এ ব্যাপারে উল্লেখ করা যেতে পারে। রাজশক্তির ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলেই অষ্টম হেনরী পোপের কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করতে সাহস পান। রাজতন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধির সাথে আঞ্চলিক ভাষাগুলির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। ফলে একই অঞ্চলে বসবাসকারী একই ভাষা সাহিত্য প্রভৃতির মাধ্যমে জাতীয় চেতনার সম্প্রসারণ ঘটে। জাতীয় রাষ্ট্রসৃষ্টির পিছনে এগুলির অবদান ছিল অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।

পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সেই প্রথম জাতীয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। কালক্রমে পুর্তুগাল, স্পেন ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। এ যুগের জাতীয় স্বার্থ ও চেতনা যে ধর্মের বন্ধনকেও অগ্রাহ্য করতে পেরেছিল তার বিশেষ এক দৃষ্টান্ত হল বর্তমান হল্যাণ্ড (নেদারল্যাণ্ড) অঞ্চল। ক্যাথলিক স্পেনের অধীনতা উচ্ছেদ করার জন্য নেদারল্যাণ্ডে প্রোটেস্টাণ্টদের বিদ্রোহ সুরু হয়। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাচদের নেতা অরেঞ্জ বংশীয় উইলিয়ামকে হত্যা করা হলেও এদের জাতীয় স্পৃহা নষ্ট করা যায় নাই। এই ঘটনার কয়েক বছরের মধ্যেই ইংল্যাণ্ডের কাছে স্পেনের নৌবাহিনীর হার এদের বিশেষ উৎসাহ জোগায়। ফলে ষোড়শ শতাব্দী শেষ হবার আগেই স্পেন রাজ দ্বিতীয় ফিলিপের সৈন্যবাহিনা টার্নহাউটের যুদ্ধে ডাচদের কাছে পরাজিত হয় ও ডাচরা জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করে।

মধ্যযুগের শেষদিকে সামন্তদের ক্ষমতা হ্রাস ও 'বুর্জোয়া'শ্রেণীর ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ হ'ল ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ও শহর প্রভৃতির সৃষ্টি। এই 'বুর্জোয়া' বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের স্বার্থেই রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কালক্রমে দেশের শাসন ব্যবস্থায় এরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে। ইংল্যাণ্ডে স্টুয়াট আমলে রাজার সাথে পার্লামেন্টের যে বিবাদ সুরু হয় তার প্রথম ও প্রধান কারণ হ'ল রাজার একছত্র ক্ষমতা বা 'ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা' প্রভৃতির বিলোপ ঘটিয়ে দেশের শাসন ও আইন ব্যবস্থায় জনসাধারনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। গৃহযুদ্ধ ও গৌরবময় বিপ্লবের (১৬৮৮ খ্রীঃ) মাধ্যমে এই বিরোধের নিষ্পত্তি হয়। শুধুমাত্র রাজা নয় রাজা সহ পার্লামেন্টই ইংল্যাণ্ডের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এটাই এসময় স্বীকৃত হয়।

অনুশীলনী

১। 'রেঁনেসাঁস' কথাটির অর্থ কি ?

২। ইতিহাসে মধ্যযুগের শেষ কোন্ সময় থেকে সাধারণত ধরা হয় ও এ ব্যাপারে তোমার মতামত কি ?

৩। 'রেঁনেসাঁসের' সাথে জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক কিভাবে গড়ে উঠে ? এর কারণই বা কি ?

———